

চেতনা

মে সংখ্যা, ২০২১

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের পত্রিকা **'চেতনা'** মে সংখ্যা, ২০২১

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদকমন্ডলী- প্রসেনজিৎ, অভিষেক, অনিমেষ, পথিক, সায়ন এবং দেবস্মিতা।

যোগাযোগ:

ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com

টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

মূল্য- ত্রিশ টাকা

ওয়েবসাইট- https://rationalists.wixsite.com/chetona

সূচি-

সম্পাদকীয়

গত এপ্রিল সংখ্যার পাঠ-প্রতিক্রিয়া বেশ কিছু পেলাম, তাতে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করার অদম্য প্রেরণা জুগিয়েছে। এভাবেই মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদীদের লেখনীতে পত্রিকাটি নিরন্তর সমৃদ্ধ হওয়ায় বাংলায় যুক্তিবাদের চর্চায় পত্রিকাটি স্থান দখল করে নিচ্ছে। ম্যাগাজিন প্রকাশ হতে বিশেষ দেরী হচ্ছে তারজন্য ক্ষমাপ্রার্থী, পরের সংখ্যা থেকে ওই মাসের ২০ তারিখের আগে লেখা জমা দিন, তাহলে উক্ত মাসের ২৫-তারিখের দিকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। আপনারা পত্রিকা সম্পর্কে মতামত পাঠান, নির্বাচিত মতামতগুলি পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

ভারত পথিক

-দেবস্মিতা

২২-মে বাংলা নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন। মানুষটি সারাজীবন কাজ করে গেছেন শিক্ষা সংস্কারক এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে। প্রতিবাদ করেছেন সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বন্ধ করেছেন 'সতীদাহ' -এর মত কুপ্রথা। স্রোতের অনুকূলে নয় বরং স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে সত্যের জন্য লড়াই করতে হয়। মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করতে গিয়ে সমাজের চক্ষুশূল হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তাতেও দমানো যায়নি। শেষপর্যন্ত পাশ করিয়েছিলেন 'সতীদাহ প্রথা ' নিষিদ্ধ আইন। জন্মদিনে তাঁকে শতকোটি প্রণাম।

বি দ্র : রাম, যে কিনা নিজের স্ত্রীকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে পাঠিয়েছিল সে নয়, যে মানুষটি নারীদের মর্যাদা রক্ষার্থে লড়াই করে গেছেন আজীবন, প্রণম্য হোক সেই রাজা রামমোহন রায়।



রেড ভলান্টিয়ার্স

-বিতান সানা

এই তো সেদিন। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে স্নান সেরে বই নিয়ে বসেছি। সারাদিন একটুও বইমুখো হইনি। হইনি বলাটা ভুল হবে। হওয়ার সুযোগ হয়নি।

পড়তে পড়তে কখন রাত সাড়ে ১১টা বেজে গেছে খেয়াল নেই। হুশ ফিরলো একটা ফোনে। অচেনা নম্বর। গত ১ মাসে এরম বহু অচেনা নম্বর থেকে ফোন এসেছে। তাই বেশি না ভেবেই রিসিভ করলাম।

রেড ভল্যান্টিয়ার্স?

হ্যাঁ বলছি।

আমি উৎপল সেনগুপ্ত। নবপল্লী ভদ্রবাড়ি থেকে বলছিলাম।

হ্যাঁ বলুন। আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?

দাদা, আমার মায়ের স্যাচুরেশন লেভেল অনেকটা নেমে গেছে। ৮০ চলছে। একটা Oxygen সিলিন্ডারের জোগাড় করে দিতে পারেন?

ঠিক আছে। আমরা ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছচ্ছি। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

ফোনটা রেখেই কোনরকমে তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেলাম। বেরোনোর আগে ফোন করলাম আমাদেরই আরেক রেডভল্যান্টিয়ারকে। বাবু বিশ্বাস। আমাদের পাড়াতেই থাকে। বয়সে আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাকে দাদা বলেই ডাকি। ও আমাকে নানান বিষয়ে গাইড করে। যাইহোক, অফিস থেকে সিলিন্ডারটা বের করেই দুজনে রওনা হলাম। উৎপলবাবু বাড়ির বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন, সম্ভবত পায়চারী করছিলেন। আমাদের আসতে দেখে মনে হলো একটু দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন। অক্সিমিটারে যখন তার মায়ের স্যাচুরেশন লেভেলটা চেক করলাম, সেটা ৭৮-৭৯ এ আপডাউন করছে। তড়িঘড়ি সিলিন্ডার সেট করে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা হলো। কিছুক্ষণ বাদে স্যাচুরেশন লেভেল বেড়ে দাঁড়ালো ৮৪-৮৫। উৎপলবাবুকে বললাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি পড়লে যেন নিঃসংকোচে জানান। মনে হলো উনি আমাদের ভরসা করলেন। আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানালেন। সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত ১টা বেজে গেছিলো। পরেরদিন উৎপলবাবু নিজে থেকেই ফোন করে জানালেন ওনার মা এখন সুস্থ। শ্বাসকষ্ট আর হচ্ছেনা। অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল ৯০-৯১ দেখাচ্ছে।

গত ১ মাসে শয়ে শয়ে এরম ফোন কল রিসিভ করেছি। তাদের প্রায় অধিকাংশই অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। চেষ্টা করলেও সবাইকে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে পারিনি আমরা। ফোনেই বলতে বাধ্য হয়েছি। সরি। কারণ চাহিদামতো অক্সিজেনের যোগান সেদিন ছিলোনা। তাই অকালে চোখের সামনে অক্সিজেন না পেয়ে মারাও যেতে দেখেছি বহু মানুষকে। এপ্রিলের শেষদিকে আমাদেরই এক রেডভল্যান্টিয়ারের বাবা অক্সিজেন না পেয়ে মারা গেছেন। আবার এরমও হয়েছে যে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়ার পরেও স্যাচুরেশন লেভেল বাড়েনি, কমতে কমতে দম কেড়ে নিয়েছে রোগীর। বর্তমানে পরিস্থিতি আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো। বারাসাতে অক্সিজেনের যোগান এখন কমবেশি আছে। তবে রক্তের আকালটা এখনো মেটেনি। গত ১ মাসে

অনেককেই রেডভল্যান্টিয়ার্স রক্তের ব্যবস্থা করে দিলেও রক্তের জন্য রোগীর পরিবারকে এখনও এদিক থেকে সেদিক ছুটতে হচ্ছে। বারাসাত হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে গিয়েও রোগীর আত্মীয় রক্ত পাচ্ছেন না। ফোন করছেন আমাদের। আমাদের রেডভল্যান্টিয়ার্সরাই ছুটে যাচ্ছে রক্ত দিতে। আজ যখন এই প্রবন্ধটি লিখছি সেই মুহূর্তেও রোগীর আত্মীয় কোথাও রক্ত না পেয়ে রেডভল্যান্টিয়ার্সের কাছে A নেগেটিভ দু ইউনিট রক্ত জোগাড় করে দেওয়ার অনুরোধ করছেন।

খাবার পৌঁছে দেওয়া, ওষুধ কিনে দেওয়া বা কারও অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা ; গত ১ মাসে সবকিছুই করার চেষ্টা করেছি আমরা। এখনও করছি। তবে সবটা পেরে উঠিনি। গত ১ মাসের হিসেব করলে মোট বারাসাতবাসীর নিরিখে আমাদের সফলতার চেয়ে ব্যর্থতা বেশি। তাও আমরা চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করতে তো আর ক্ষতি নেই।

‘হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র।’

— কাজী নজরুল ইসলাম (কান্ডারী হুঁশিয়ার)



বুদ্ধ কোনো ভগবান ছিলেন না

-চিত্রদীপ সোম

বুদ্ধ কোনো ভগবান ছিলেন না। ছিলেন একান্তভাবেই দোষ গুন মিশিয়ে একজন মানুষ। বরঙ ছিলেন সেই ব্যতিক্রমী ধর্মপ্রচারকদের অন্যতম যিনি কোনো কাল্পনিক ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করেন নি মানুষের মধ্যে। মানুষ ও তার ইহজীবনই ছিলো তাঁর মতবাদের বিষয়বস্তু। এখানেই তিনি খ্রীষ্ট মহম্মদ বা শংকরাচার্য সহ অনান্য সমস্ত ধর্মপ্রচারক থেকে আলাদা। অথচ সেই বুদ্ধকেই আজ ভগবান হিসাবে পুজো করা হয়, নবম অবতার মনে করা হয়, এর চেয়ে হাস্যকর ও আপত্তিকর কিছুই হতে পারে না।

প্রসঙ্গতঃ বুদ্ধের যে ছবি বা মূর্তিগুলি দেখি আমরা তার কোনোটাই তাঁর আসল রূপকে তুলে ধরে না। বুদ্ধের আসল চেহারা আমাদের অজানা। কারণ বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর কোনো মূর্তি বা ছবি বানানো হয় নি। বুদ্ধের প্রথম মূর্তি বানানো বা ছবি আঁকা হয় তাঁর মৃত্যুর প্রায় পাঁচশো বছর পর। বলাবাহুল্য সেই শিল্পীরা কেউই চোখে দেখেন নি বুদ্ধকে। তাই কল্পনাই ছিলো তাদের একমাত্র ভরসা। গান্ধার শিল্পরীতিতে প্রস্তুত এইসব ছবি বা মূর্তিগুলি তাই বুদ্ধকে সঠিকভাবে তুলে ধরে না। বরঙ এই মূর্তি বা ছবিগুলোর সাথে অনেক বেশী মিল পাওয়া যায় গ্রীক দেবতাদের।

যে সময় আসমুদ্র হিমাচল ছিলো গোঁড়ামি, জাতপাত, আর কুসংস্কারে নিমজ্জিত, সেই সময় দাঁড়িয়ে তিনি বেদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরলেন। দৃঢ়তার সাথে বেদের অপৌরুষেয়তাকে অস্বীকার করলেন। অস্বীকার করলেন স্বর্গ নরকের ছেলেভোলানো গালগল্পকে। অস্পৃশ্যতাকে ছুড়ে ফেলে দিতে চাইলেন সমাজ জীবন থেকে। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যখন দেখি কোনো বিজ্ঞানের অধ্যাপকের হাতে গ্রহরত্নের আংটি, ডাক্তারকে দেখি অপারেশনের আগে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না কী সাংঘাতিকভাবে সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন এই মানুষটি। বুঝতে অসুবিধা হয় না আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের তমসাঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে দেবদ্বিজকে অস্বীকার করতে হলে কতটা কলজের জোর দরকার হয়েছিলো তাঁর।

বুদ্ধ সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ছিলেন রাজ পরিবারের সন্তান। মানুষ হয়েছেন রাজ বৈভবের মধ্যে। পরবর্তীকালেও পেয়েছেন রাজঅনুগ্রহ। তাই মানুষের দুঃখকষ্টের বস্তুবাদী কারণ অনুসন্ধান তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। মানুষের দুঃখকষ্টের পিছনে যে সম্পদের অসম বন্টন লুকিয়ে আছে তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নি। ইহজীবনের দুঃখের জন্য তিনি ভুলভাবে দায়ী করে গেছেন কামনা ও বাসনাকে। মনে করেছেন কামনা বাসনার অবসান হলেই দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। এটা বুদ্ধের সীমাবদ্ধতা। বুদ্ধের সময়ের সীমাবদ্ধতা। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বিকাশের সময় সেটা ছিলো না। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক রূপ তাই বুদ্ধের চোখে ধরা পড়ে নি। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যেটুকু ইতিবাচক দর্শনের সূচনা তিনি করেছেন তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হতেই হয়।

অহিংসা ছিলো তাঁর ধর্মের মূল কথা। কিন্তু এখানেও তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। জৈন ধর্মের মতো ইঁটকাঠ পাথরেও তিনি প্রানের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ান নি। উপরন্তু অসুখ হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাংস খাওয়ারও বিধান দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় বাস্তবতাবর্জিত আদর্শবাদী তিনি ছিলেন না। বরঙ বাস্তবতাবোধ নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর নীতিবোধকে। ঘন ঘন যুদ্ধের রাজতন্ত্রের যুগে দাঁড়িয়ে তিনি গেয়ে গেছেন অহিংসার জয়গান, জীবনের জয়গান। যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানো, যুদ্ধবন্দীনিদের যৌনদাসী বানানো, বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধে মদত দেওয়া, পরকালে সুন্দরী মহিলার লোভ দেখানো, ইত্যাদি তাঁর চরিত্রে ছিলো না। ছিলেন একান্তভাবেই সত্য ও সুন্দরের উপাসক। আজ যখন যুদ্ধে দীর্ণ, ভাতৃঘাতী হানায় দীর্ন পৃথিবীকে দেখি, তখন অনুভব করি বুদ্ধের উপদেশ আজও কী পরম প্রাসঙ্গিক।

রোমিলা থাপার বলেছিলেন বিশ্বকে দেওয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ উপহার গৌতম বুদ্ধ। আমার মতও তাই। শুধু ভারত নয়, এই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান তিনি। এই হিংসা, হানাহানিতে ভরা পৃথিবীর বুকে তাই জেগে থাকুন বুদ্ধ, জেগে থাকুক তাঁর বরাভয়ের মুদ্রা। প্রতি বুদ্ধ পূর্ণিমা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিক রাজকীয় বিলাসিতাকে হেলায় পরিত্যাগ করা এই ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীকে।

ওঁং বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি।

তখন আমৃত্যু লিখে যাব প্রতিবাদ
উন্মত্ত হিংস্র ও ক্রুদ্ধ নিরবধি
এ যদি সমাজ হয়
তবে আমি সমাজবিরোধী
— নবারুণ ভট্টাচার্য (সমাজবিরোধিতার কথা)



বুদ্ধ যেভাবে জাতিভেদের বক্ষে কুঠারাঘাত করেছিলেন

-বিজয় ভৌমিক

জাতিভেদের ফলে ভারতবর্ষের মানুষেরা যে দীর্ঘদিন ধরে দুর্গতির শিকার হয়েছিল, তা সর্বজনবিদিত। প্রতারক ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বাকি বর্ণকে নিকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন করতো। কোনো ব্যক্তি যে জাতিতে জন্মেছে তার থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, ইচ্ছমত জীবিকা গ্রহণ করে বাঁচার স্বাধীনতা মানুষের ছিল না, সংস্কারহীন গতিহীন বদ্ধ জলাশয়ের মত দূষিত হয়ে পড়েছিল সমাজ, শূদ্র এবং অস্পৃশ্যদের প্রতি সীমাহীন অবিচার তৎকালীন কলুষিত সমাজের বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতবর্ষের এমন চরম দুর্গতির দিনে মহাত্মা বুদ্ধ আলোকবর্তিকা হাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সকল বিভেদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, নিপীড়িতের কষ্ট তার করুণা দিয়ে দূর করেছিলেন। তিনি বারবার তার যুক্তি দ্বারা মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জাতিভেদের অসারতা। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের কথা ত্রিপিটকের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। মহামতি বুদ্ধের এই মহৎ দিকটির বর্ণনা থাকছে বর্তমান লেখাটিতে।

জন্ম দ্বারা নয়, কর্ম দ্বারাই কেউ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি হয়

একসময় বুদ্ধ ইচ্ছানঙ্গল গ্রামের কাছে ইচ্ছানঙ্গল বনে অবস্থান করছিলেন। সেইসময় অনেক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ইচ্ছানঙ্গল গ্রামে থাকতেন। তাদের মধ্যে বাসিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ এই দুই তরুণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'মানুষ জন্মের কারণে শ্রেষ্ঠ হয় নাকি কর্মের কারণে শ্রেষ্ঠ হয়?' এই নিয়ে তর্ক দানা বাধে।

ভরদ্বাজ বলেন, " হে বাসিষ্ঠ, যার মাতৃবংশ ও পিতৃবংশ সাত পুরুষ পর্যন্ত শুদ্ধ আছে, যার কুলে সাতপুরুষ পর্যন্ত বর্ণসঙ্কর হয়নি সেই ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ।"

বাসিষ্ঠ বলেন, " হে ভরদ্বাজ! যে মানুষ শীল সম্পন্ন ও কর্তব্য পরায়ণ তাকেই ব্রাহ্মণ বলা উচিত।"

এই বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ভীষণ তর্ক চলতে থাকে। কিন্তু তারা পরস্পর কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। শেষে বাসিষ্ঠ বলেন, " হে ভরদ্বাজ, আমাদের এই তর্কবিতর্ক এখানে মিটবে না। আমাদের গ্রামের কাছে শ্রমণ গৌতম বাস করছেন। তিনি বুদ্ধ, পুজ্য এবং সর্বলোকের গুরু বলে প্রসিদ্ধি আছে। চলো তার কাছে গিয়ে আমাদের বিবাদের কথা জানাই। তিনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন আমরা তাই মেনে নেব।"

এরপর দুজন বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হন। বাসিষ্ঠ বুদ্ধকে বলেন, " হে গোতম, আমরা দুজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণপুত্র। ও তারুক্ষের শিষ্য, আমি পৌকরসাদির শিষ্য। আমাদের মধ্যে জাতিভেদ নিয়ে এক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। ভরদ্বাজ বলছে, জন্মদ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ হয় কিন্তু আমি বলি মানুষ কর্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। আপনিই বলুন যথার্থ

ব্রাহ্মণ ঠিক কিভাবে হওয়া যায়? আমরা আপনার কীর্তির কথা শুনেছি, তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি আমাদের এই বিতর্কের সমাধান করুন।"

তাদের কথা শুনে বুদ্ধ বলেন, হে বাসিষ্ঠ, তৃণ, বৃক্ষ প্রভৃতি বনস্পতিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি পোকা, পিঁপড়া প্রভৃতি ছোটো ছোটো প্রাণীদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখতে পাওয়া যায়। সর্প, শ্বাপদ, জলচর , মৎস্য এবং আকাশগামী পাখিদের মধ্যেও অনেক জাতি আছে। তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বর্তমান, যার মাধ্যমে তাদের আলাদা বলে চেনা যায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন পার্থক্য দেখা যায় না। চুল, কান, চোখ, মুখ, নাক, ঠোঁট, ভ্রু, ঘাড়, পেট, পিঠ, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গে এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং পশুপাখিদের মধ্যে যেমন আকার-আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখতে পাওয়া যায়, তেমন মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। সব মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একইরকম বলে মানুষের মধ্যে জাতিভেদ নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু মানুষের জাতি কর্ম দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

যদি কোনো ব্রাহ্মণ গোপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে তাকে গোয়ালা বলবে, ব্রাহ্মণ নয়। যে শিল্পকলার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, সে কারিকর, ব্রাহ্মণ নয়। যে ব্যবসা করে সে বণিক, ব্রাহ্মণ নয়। যে দূতের কাজ করে সে দূত, ব্রাহ্মণ নয়। যে চুরিদ্বারা জীবিকা অর্জন করে সে চোর, ব্রাহ্মণ নয়। যে যুদ্ধ দ্বারা জীবিকা অর্জন করে সে যোদ্ধা, যে যাগযজ্ঞের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে সে যাজক এবং যে রাজ্যদ্বারা জীবিকা অর্জন করে সে রাজা। কিন্তু এদের মধ্যে কাউকেও কেবলমাত্র জন্মের কারণে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না।

যিনি সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, সংসারের দুঃখকে ভয় করেন না, যার কোনো ব্যাপারেই কিছুমাত্র আপত্তি নেই, তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। অন্যের দেওয়া গালি, অন্যের লোকসান ও অসুবিধা যিনি সহ্য করেন, ক্ষমাই যার বল তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। যিনি পদ্মপাতায় জলের মত, যিনি ইহলোকের বিষয়সুখ হতে অলিপ্ত থাকেন, তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

"জন্মেতে ব্রাহ্মণ নহে, নাহি হয় জন্মে অব্রাহ্মণ,
কর্মেতে ব্রাহ্মণ হয়, কর্মবশে হয় অব্রাহ্মণ।
কৃষক কর্মেতে হয়, শিল্পি হয় কর্মের কারণ,
বণিক কর্মেতে হয়, প্রেষ্য হয় কর্ম নিবন্ধন।
চোর হয় কর্মহেতু, যোদ্ধা জীব কর্মের কারণ,
যাচক কর্মেতে হয়, রাজা হয় কর্ম নিবন্ধন।
কর্ম আর ফলজ্ঞানী প্রতীত্য সমুৎপাদ দর্শীগণ,
পণ্ডিতেরা এই কর্ম যথাভূত করে নিরীক্ষণ।
কর্মেতে চলেছে বিশ্ব, কর্মহেতু ভ্রমে প্রাণীগণ,
আণিবদ্ধ রথচক্র সম ঘুরে কর্মে জীবগণ।
তপস্যায় ব্রহ্মচর্যে সংযমে ও ইন্দ্রিয় দমনে,
ইহাতে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ উত্তম শুধু গুণে। "

বুদ্ধের এই উপদেশ শুনে বাসিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ বুদ্ধের শরণ নিলেন।

[সুত্তপিটক\মজ্ঝিমনিকায়\ব্রাহ্মণবর্গ\ বাসেট্ঠসুত্ত]

ব্রাহ্মণ কিভাবে হয়?

বুদ্ধ জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ

“জটা, গোত্র বা জাতির পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যার অন্তরে সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই পবিত্র, তিনিই ব্রাহ্মণ।”

“হে নির্বোধ, তোমার জটা বা মৃগচর্ম ধারণে কি হবে? তোমার অন্তঃকরণ ক্লেদপূর্ণ, তুমি শুধু বাইরে মার্জনা করছ।”

“জাতি বা মায়ের পরিচয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সে আমি ব্রাহ্মণ এরূপ নাম কীর্তন করে বৃথাই অহংকার করে। যিনি অনাসক্ত ও নিষ্পাপ তিনিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য।”

ধম্মপদে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় জুড়ে বুদ্ধের এসকল কথা পাওয়া যাবে। একটি স্বতন্ত্র লেখায় পূর্বেই ধম্মপদের বাণীগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যারা আগ্রহী তারা ওই লেখাটি পড়ে দেখতে পারেনঃ বুদ্ধের চোখে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে?

একই রকমের কথা সংযুক্তনিকায়ের ব্রাহ্মণ সংযুক্তের শুদ্ধিক সূত্রে আছে। এখানে ভরদ্বাজ নামে এক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ বলেছেন, ” যার অন্তর কলুষিত, যে পাপকর্মে লিপ্ত, সে অনেক প্রলাপ বকলেও (ব্রাহ্মণ মাত্রই শুদ্ধ হয় এমন প্রলাপ) জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল বা ঝাড়ুদার যেই হোক না কেন সে যদি সদাচারসম্পন্ন হয়, তাহলে সেই পরম শুদ্ধি লাভ করে। ”

ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে কোনো ভেদ নেই

একবার বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডকের বাগানে অবস্থান করছিলেন। তখন বিভিন্ন দেশ থেকে কোনো কারণে ৫০০ ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে আগমন করেছিলেন। কথোপকথনকালে তাদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ওঠে, ” শ্রমণ গৌতম বলেন চার বর্ণই মোক্ষ লাভ করতে পারবে। তার সাথে তর্ক করে কে তার মতের খণ্ডন করবে?” অবশেষে তারা আশ্বলায়ন নামে এক ব্রাহ্মণপুত্রকে এই কাজে নিযুক্ত করবেন বলে স্থির করেন।

আশ্বলায়নের পড়াশোনা সবে মাত্র শেষ হয়েছিল। তিনি নিঘন্টু, ছন্দশাস্ত্র ইত্যাদি বেদাঙ্গের সাথে বেদও শিখেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের সাথে তর্ক করা যে সহজ নয় তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। বুদ্ধের সাথে তর্ক করার জন্য যখন তাকে বাছাই করা হল তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণদের বললেন, “দেখুন, শ্রমণ গোতম ধার্মিক লোক, এবং ধার্মিক লোকের সাথে তর্ক করা সহজ নয়। যদিও আমি সকল বেদে পারদর্শী হয়েছি, কিন্তু গোতমের সাথে তর্ক করার ক্ষমতা আমার নেই।”

আশ্বলায়নের সাথে অনেক কথা কাটাকাটি করার পর ব্রাহ্মণেরা আশ্বলায়নকে বললেন, “দেখ আশ্বলায়ন, তুমি বুদ্ধের ধর্ম অধ্যয়ণ করেছ, তাই যুদ্ধ ছাড়াই পরাজয় স্বীকার করা তোমার উচিত হচ্ছে না। ”

একথা শুনে আশ্বলায়ন বললেন, “যদিও গোতমের সাথে তর্ক করা কঠিন, তবুও আপনারা যখন এত করে বলছেন আমি আপনাদের সাথে আসছি।”

এরপর আশ্বলায়ন সেই ব্রাহ্মণদের সাথে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। আশ্বলায়ন বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, ” হে গোতম, ব্রাহ্মণরা বলে যে ব্রাহ্মণবর্ণই শ্রেষ্ঠ, অন্যান্য বর্ণ নীচ; ব্রাহ্মণবর্ণই শুক্ল, অন্যান্য বর্ণ কৃষ্ণ;

ব্রাহ্মণরাই মোক্ষ লাভ করে, অন্যরা করে না। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদেবের মুখ হতে উৎপন্ন হয়েছে, তারা তার ঔরসপুত্র; এজন্যই তারা ব্রহ্মদেবের উত্তরাধিকারী। হে গোতম ঐ সম্বন্ধে আপনার মত কি?”

বুদ্ধ- হে আশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের মেয়েরা ঋতুমতী হয়, তারা গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তারা প্রসব করে, আর তারা নিজের সন্তানকে স্তন পান করায়। এভাবে ব্রাহ্মণের সন্তান অন্যান্য বর্ণের মতই মাতৃগর্ভ হতে জন্ম নেয়। এরপরেও যদি ব্রাহ্মণেরা বলে যে তারা ব্রহ্মদেবের মুখ হতে উৎপন্ন হয়েছে, তাহলে তা আশ্চর্যের নয় কি?

আশ্বলায়ন- হে গোতম, আপনি যাই বলুন না কেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদেবের উত্তরাধিকারী। ব্রাহ্মণেরা একথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন।

বুদ্ধ- হে আশ্বলায়ন যবন, কম্বোজ প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশগুলিতে কেবল আর্য ও দাস এই দুটি বর্ণ বাস করে, সেখানে কখনো আর্য দাস হয় এবং দাস আর্য হয়, একথা তুমি শুনেছ কি?

আশ্বলায়ন- হ্যাঁ, আমি একথা শুনেছি।

বুদ্ধ- যদি এই কথা সঠিক হয়, তাহলে ব্রহ্মদেব যে ব্রাহ্মণদের মুখ হতে উৎপন্ন করেছিলেন এবং তারা যে সর্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ, একথার ভিত্তি কি?

আশ্বলায়ন- আপনি যাই বলুন, ব্রাহ্মণদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তারাই সর্ববর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর অন্যান্য বর্ণরা তাদের তুলনায় হীন।

বুদ্ধ- ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র যদি প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যা-ভাষণ, প্রতারণা, গালাগালি, বৃথাভাষণ ইত্যাদি করে, যদি অন্যের ধনের উপর লোভ রাখে, যদি অপরকে দ্বেষ করে, তাহলে শুধু তারাই মৃত্যুর পর নরকে যাবে। ব্রাহ্মণেরা যদি এসব খারাপ কাজ করে তবে তারা নরকে যাবে না। তুমি কি একথা মনে কর?

আশ্বলায়ন- হে গোতম, যে কোনো বর্ণের মানুষই হউক না, সে যদি এইসব পাপকর্ম করে তাহলে মৃত্যুর পর সে নরকে যাবে। ব্রাহ্মণ হলেই বা কি, আর অব্রাহ্মণ হলেই বা কি, সকলকে নিজ নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়।

বুদ্ধ- যদি কোনো ব্রাহ্মণ প্রাণনাশ হতে নিবৃত্ত হয়, চুরি, মিথ্যাকথন, প্রতারণা, গালাগালি, বৃথাপ্রলাপ, পরদ্রব্যে লোভ, দ্বেষ এসব পাপ হতে নিবৃত্ত হয় তাহলে শুধু সেই মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে কিন্তু ক্ষত্রিয় , বৈশ্য বা শূদ্ররা যাবে না, একথা কি তুমি মনে কর?

আশ্বলায়ন- যে কোনো বর্ণের ব্যক্তিই যদি এইসব পাপকার্য হতে বিরত থাকে তাহলে সে স্বর্গে যাবে। পুণ্যের ফল ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ সকলেই সমানভাবে পাবে।

বুদ্ধ- শুধু ব্রাহ্মণরাই বিদ্বেষ ও শত্রুতা ত্যাগ করে মৈত্রী ভাবনা পোষণ করতে পারে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তা পারে না, একথা তুমি কি মনে কর?

আশ্বলায়ন- চার বর্ণের মানুষেরাই মৈত্রী ভাবনা পোষণ করতে পারে।

বুদ্ধ- ব্রাহ্মণেরাই কি কেবল স্নানের মাধ্যমে শরীরের ময়লা দূর করতে পারে, অন্যান্য বর্ণরা পারে না?

আশ্বলায়ন- না, গোতম, চার বর্ণের মানুষই একাজ করতে পারে।

বুদ্ধ- তাহলে ব্রাহ্মণ বর্ণই শ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য বর্ণ নিকৃষ্ট, একথার অর্থ কি? মনে কর, কোনো সার্বভৌম চক্রবর্তী রাজা প্রত্যেক বর্ণের একশ জন পুরুষ একত্র করলেন এবং তাদের মধ্যে যারা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও রাজকুলে জন্মেছে তাদের বললেন, " ওহে তোমরা এদিকে এসো, শাল কিংবা চন্দনের মত উৎকৃষ্ট কাঠ নিয়ে অগ্নি উৎপন্ন কর; আর চণ্ডাল, নিষাদ প্রভৃতি হীনকুলে জন্ম নেওয়া মানুষদের বললেন, যে গর্তে কুকুরকে খেতে দেওয়া হয়, যে গর্তে শুকরকে খেতে দেওয়া হয় সেই গর্তে অথবা রঞ্জকের গর্তে এরণ্ডর কাঠ দিয়ে অগ্নি উৎপন্ন কর। হে আশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মানুষরা উৎকৃষ্ট কাঠ দিয়ে যে আগুন জ্বালাবেন কেবল সেটিই কি উজ্জ্বল ও তেজপূর্ণ হবে,আর চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের মানুষরা নিকৃষ্ট কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাবেন সেটি উজ্জ্বল ও তেজপূর্ণ হবে না? তুমি কি এমন মনে কর?

আশ্বলায়ন- হে গোতম, যে কোনো বর্ণের মানুষই হোক না কেন, সে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যেকোনো কাঠ দ্বারা যেকোনো জায়গাতেই আগুন জ্বালাক না কেন, সর্ব স্থানেই আগুন সমান উজ্জ্বল ও তেজপূর্ণ হবে।

বুদ্ধ- কোনো ক্ষত্রিয়ের ছেলে যদি ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করে ও তাদের একটি ছেলে হয়, তাহলে ঐ ছেলেটি তার পিতামাতার মতই মানুষ হবে, একথা কি তোমার মনে হয় না? তেমনি কোনো ব্রাহ্মণ পুত্র যদি ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করে ও তাদের একটি ছেলে হয়, তাহলে সে কি পিতামাতার মত না হয়ে কিম্ভুতকিমাকার কোনো প্রাণী হয়? তুমি কি একথা মনে কর?

আশ্বলায়ন- এমন মিশ্র বিবাহে যে সন্তান হয়, তা পিতামাতার মতই মানুষ হয়ে থাকে। তাকে ব্রাহ্মণও বলা যেতে পারে, ক্ষত্রিয়ও বলা যেতে পারে।

বুদ্ধ- কিন্তু হে আশ্বলায়ন, একটি ঘোড়া ও গাধার মিলনের ফলে যে সন্তান হয়, তাকে কি তার মাতার মত কিংবা পিতার মত বলা যায়? তাকে কি ঘোড়াও বলে যেতে পারে, আবার গাধাও বলা যেতে পারে?

আশ্বলায়ন- হে গোতম, তাকে ঘোড়া কিংবা গাধা বলা যায় না। তা তৃতীয় কোনো জাতির হয়ে থাকে। তাকে আমরা খচ্চর বলি। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্পর্কের ফলে যে সন্তান জন্মে তার মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় না।

বুদ্ধ- হে আশ্বলায়ন, দুটি ব্রাহ্মণ ভাইয়ের মধ্যে যদি একজন বেদ অধ্যয়ণ করে ভালো পণ্ডিত হয় ও অপরজন অশিক্ষিত থেকে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে কাকে ব্রাহ্মণরা শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞে প্রথম নিমন্ত্রণ করবে?

আশ্বলায়ন- যে পণ্ডিত তাকে নিমন্ত্রণ করা হবে।

বুদ্ধ- এখন মনে কর, দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন বিদ্বান কিন্তু অত্যন্ত দুঃশীল কিন্তু অপরজন বিদ্বান নয় কিন্তু সুশীল, তাহলে তাদের মধ্যে প্রথম কাকে নিমন্ত্রণ করবে?

আশ্বলায়ন- হে গোতম, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, তাকেই প্রথম নিমন্ত্রণ দেওয়া হবে। দুষ্ট ব্যক্তিকে দান করে কি কোনো মঙ্গল হয়?

বুদ্ধ- হে আশ্বলায়ন, তুমি প্রথমে 'জাতিকে' গুরুত্ব দিয়াছিলে, এরপর বেদাভ্যাসকে ও এখন 'চরিত্রকে' গুরুত্ব দিচ্ছ। অর্থাৎ আমি চাতুর্বর্ণে যে সংস্কার করতে চাই, তাই তুমি মেনে নিচ্ছ।

বুদ্ধের একথা শুনে আশ্বলায়ন মাথা নিচু করে চুপ করে রইলেন। এরপর কি বলবেন তা আর ভেবে পেলেন না। অবশেষে আশ্বলায়ন বুদ্ধের ভক্ত হয়েছিলেন।

[সুত্তপিটক/ মজ্ঝিমনিকায়/ আশ্বলায়ন সূত্র]

এই সূত্রে অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়ে যেভাবে বুদ্ধ জাতিভেদকে খণ্ডন করলেন, একইরকম কথা সূত্তপিটকের মজ্ঝিমনিকায়ের কণ্ণকত্থল সুত্তে পাওয়া যাবে, সেখানেও বুদ্ধ অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়ে জাতিভেদের খণ্ডন করেছেন। বুদ্ধের মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভরদ্বাজ এবং বাসেট্ঠ শ্রমণ হয়েছিলেন। এর ফলে ব্রাহ্মণেরা তাদের নানাভাবে তিরস্কার করতো। ভরদ্বাজ ও বাসেট্ঠের সাথে কথোপকথনকালে একবার বুদ্ধ তাদের জিজ্ঞেস করেন, ব্রাহ্মণ হতে শ্রমণ হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণেরা তাদের তিরস্কার করে কিনা! বাসেট্ঠ বুদ্ধকে জানান যে ব্রাহ্মণেরা তাদের নানা উপায়ে তিরস্কার করে। তিরস্কার করার সময় তারা ঠিক কি বলে তা বুদ্ধকে জানান বাসেট্ঠ। ব্রাহ্মণদের জাতিবাদী কথাগুলোর খণ্ডন করেন বুদ্ধ। আশ্বলায়ন সূত্রে ব্রাহ্মণেরা যেমন দাবী করেছেন এবং বুদ্ধ যেমন উত্তর দিয়েছেন, এই ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণদের একই রকম দাবীর একই ধরণের উত্তর দেন বুদ্ধ। [উৎস]

ক্ষমতা সকলের হাতেই থাকা উচিত

একসময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডকের বাগানে অবস্থান করছিলেন। তখন এসুকারী নামে এক ব্রাহ্মণ তার কাছে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, " হে গোতম, ব্রাহ্মণেরা চার রকমের পরিচর্যার কথা বলে। ব্রাহ্মণের পরিচর্যা চার বর্ণের লোকই করতে পারে, ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের লোকেদেরই কর্তব্য, বৈশ্যের পরিচর্যা বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণের লোকেই করবে এবং শূদ্রের পরিচর্যা কেবল শূদ্রই করবে, অন্য বর্ণের মানুষেরা কিভাবে তার পরিচর্যা করবে? এই পরিচর্যা বিষয়ে আপনার মত কি?"

বুদ্ধ- হে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের এই কথায় সবলোকের সম্মতি আছে কি? পরিচর্যা করতে হবে, এই কথা যারা বলে, তারা সাধারণ মানুষকে এমন কথা বলার অধিকার দিয়েছে কি?

এসুকারী- হে গোতম, না তেমন কিছু নয়।

বুদ্ধ- তাহলে যদি কোনো গরীব মানুষ মাংস খেতে না চায়, আর তার প্রতিবেশী জোর করে তার উপরে মাংসের এক ভাগ চাপিয়ে দেয় এবং বলে,' তুমি এই মাংসটুকু খাও এবং আমাকে এর দাম দাও।' তাহলে যেমন বলতে হয়, প্রতিবেশী জোর করে তার ঘাড়ে মাংস চাপাল, তেমনি ব্রাহ্মণরা সর্ব সাধারণের উপর এই পরিচর্যাগুলো চাপিয়েছে, এমনই বলতে হবে। আমার কথা হল, যে কোনো বর্ণের মানুষই হোক না কেন, তারা বিবেচনা করবে কার পরিচর্যা করলে তাদের কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ হবে এবং তারা তারই পরিচর্যা করবে। চার বর্ণের বিবেচক লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা এরকম কথাই বলবে। উচ্চকুলে, উচ্চবর্ণে কিংবা ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করা ভালো কিংবা মন্দ তা আমি বলি না। যে ব্যক্তি উচ্চকুলে, উচ্চবর্ণে কিংবা ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে যদি প্রাণীহত্যা প্রভৃতি পাপ করতে থাকে, তাহলে তার এই কুলীনতাকে ভালো বলা যায় না। কিন্তু সে যদি প্রাণীহত্যা প্রভৃতি পাপ হতে বিরত হয় তাহলে তার কুলীনতা খারাপ নয়। যে মানুষের পরিচর্যা করলে শ্রদ্ধাশীল, বিদ্যা, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা এসবের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তাদের পরিচর্যা করবে, এটাই আমার মত।

এসুকারী- হে গোতম, ব্রাহ্মণেরা চারটি ধনের কথা বলে থাকে। ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের ধন, ধনুর্বাণ ক্ষত্রিয়দের ধন, চাষবাস ও গোরক্ষা বৈশ্যদের ধন এবং কাস্তে ও ঝাঁকা শূদ্রদের ধন। প্রহরী যদি চুরি করে তাহলে সে যেমন কর্তব্যচ্যুত হয়, তেমনি চারবর্ণের মানুষেরা যদি নিজের ধনের উপর অবহেলা করে তাহলে সেই ব্যক্তি নিজ কর্তব্য হতে বিচ্যুত হবে। এই বিষয়ে আপনার মত কি?

বুদ্ধ- হে ব্রাহ্মণ, এই চারটি ধনের কথা বলার অধিকার মানুষেরা ব্রাহ্মণদের দিয়েছে কি?

এসুকারী- না গোতম, দেয়নি।

বুদ্ধ- তাহলে যে গরীব ব্যক্তি মাংস খেতে চায় না, তার উপর মাংসের ভাগ চাপিয়ে তার মূল্য দাবী করা যেমন, ব্রাহ্মণদের এই কাজটি তেমনই বলে বুঝতে হবে। হে ব্রাহ্মণ, আমার কথা এই যে, আর্য শ্রেষ্ঠ ধর্মই সকলের নিজস্ব ধন। ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারকুলে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলা হয়। একথা বলা কাঠ, শকলিকা, তৃণ ও ঘুঁটে এই চার পদার্থ থেকে উৎপন্ন অগ্নিকে কাষ্ঠাগ্নি, শকলিকাগ্নি, তৃণাগ্নি ও গোময়াগ্নি বলার মতনই। কিন্তু এই চারকুলের মানুষ যদি প্রাণিহত্যা প্রভৃতি পাপ হতে দূরে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে শুধু ব্রাহ্মণই মৈত্রীভাবনা পোষণ করতে সমর্থ হবে আর অন্যান্য বর্ণের লোকেরা মৈত্রীভাবনা পোষণ করতে পারবে না, তুমি কি এমনটা মনে কর?

এসুকারী- হে গোতম, না, আমার সেরকম মনে হয় না।

বুদ্ধ- শুধু ব্রাহ্মণই নদীতে গিয়ে সাবান দিয়ে স্নান করে নিজের শরীরের ময়লা দূর করতে পারবে কিন্তু অন্য বর্ণের লোকেরা তা পারবে না, তুমি কি তা মনে কর?

এসুকারী- হে গোতম, না, আমার তেমন মনে হয় না। চার বর্ণের লোকই নদীতে গিয়ে সাবান দিয়ে স্নান করে নিজের শরীরের ময়লা দূর করতে পারবে।

বুদ্ধ- তেমনি হে ব্রাহ্মণ, প্রত্যেক কুলের লোকই তথাগতের উপদেশ অনুসারে চলে ন্যায্য ধর্মের আরাধনা করতে পারবে।

[সুত্তপিটক/ মজ্ঝিমনিকায়/এসুকারী সুত্ত]

তারা সকলেই বুদ্ধের পুত্র

বুদ্ধ তার সংঘে জাতিভেদের কোনো স্থান দেন নি। বুদ্ধ বলেতেন, ” হে ভিক্ষুগণ, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরযু, মহী এই মহানদীগুলো মহাসমুদ্রে মিলিত হলে নিজ নিজ নাম ত্যাগ করে যেমনি মহাসমুদ্র নাম প্রাপ্ত হয়, তেমনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ তথাগতের সংঘে প্রবেশ করলে পূর্বের নাম, গোত্র পরিত্যাগ করে ‘শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ এই এক নামে পরিচিত হয়।” [উদান ৫/৫ ও অঙ্গুত্তরনিকায় অট্ঠকনিপাত]

একইপ্রকার কথা ত্রিপিটকের অন্যত্রও আছে। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ থেকে শ্রমণ হওয়া বাসেট্ঠকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “বাসেট্ঠ, তোমরা নানাজাতি, নানানাম, নানা গোত্রবিশিষ্ট, নানাকুল থেকে গৃহত্যাগ করে তোমরা গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেছ। যদি তোমরা জিজ্ঞাসিত হও “তোমরা কে?” তাহলে “আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ” এরূপ উত্তর দেবে।” [উৎস]

কুলের তোয়াক্কা না করে বুদ্ধ অঙ্গুত্তরনিকায়ের বচ্ছপুত্র সূত্রে বলেছেন, “পশুর পালে সাদা, কালো, লাল, তামাটে , রঙ বেরঙের বা একই রঙের অনেক পশু থাকে। যে পোষা ষাঁড় ভারবাহী, শক্তিমান, সুন্দর ও দ্রুতগামী তাকেই মানুষ ভার বহন করার জন্য যোয়াল দেয়, এর রঙ বিচার করে না। তেমনি মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কস যে কুলেই জন্ম নিক না কেন, সে যদি দান্ত, ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়বান, শীলবান, সত্যবাদী, কর্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকারী হয়, তাহলে তাকেই দান করা উচিত।”

বুদ্ধের কাছে যে জাতির গুরুত্ব নেই তা তিনি বহুবারই বলেছেন। বুদ্ধের জাতিভেদের বিরোধীতা কেবল কথাতে সীমিত ছিল না, কাজেও তা দেখা গিয়েছিল। দীক্ষা দেওয়ার সময় বুদ্ধ কখনোই কারো জাতি-কুল বিচার করেননি। তিনি যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের দীক্ষিত করেছিলেন, তেমনি পতিতা, চণ্ডাল প্রভৃতি সমাজের অবহেলিত মানুষেরাও তার করুণা লাভ করেছিল। তার ঔদার্যেই পতিতা আম্রপালি ভিক্ষুণিদের শিরোমণি হয়েছিলেন, চণ্ডাল হয়েও স্থবির শীলবান সকল মানুষের পূজনীয় হয়েছিলেন। সুনীত অস্পৃশ্য ছিলেন কিন্তু বুদ্ধ তাকে আপন করে নিয়েছিলেন। সুনীত তার অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

"আমি নীচকুলে দরিদ্র ও অনশনক্লিষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করি। আমার কাজ ভীষণ হীন ছিল, ফুল প্রভৃতি আবর্জনা পরিষ্কার করতাম। মানুষের পক্ষে যা ঘৃণ্য, অবজ্ঞার, তিরস্কৃত কাজ তা আমি করতাম, নিজেকে খুব ছোট মনে করতাম, সবাইকে দেখামাত্র আমার প্রণাম করতে হত। একদিন ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত বুদ্ধকে দেখলাম, তিনি তখন মগধ রাজ্যে প্রবেশ করছিলেন। এমন সময় আমার ভারখানা রেখে তাকে বন্দনার জন্য অগ্রসর হলাম। পুরুষোত্তম আমার প্রতি দয়া করে দাঁড়ালেন। সেই সর্বলোকের করুণাধার কারুণিক শাস্তা আমাকে 'এসো ভিক্ষু' বলে আহ্বান করলেন, তাতেই আমার উপসম্পদা হল। তখন থেকেই আমি জিনরাজের উপদেশ অনুসারে সাধনায় রত হই। " [থেরীগাথা, দ্বাদশক নিপাত, ২. সুনীত স্থবির]

ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, একথা একটা বুলি মাত্র

বুদ্ধের শিষ্যরাও বুদ্ধের কাছ থেকে সাম্যের শিক্ষা পেয়েছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে ঘটা অনেক ঘটনায় বুদ্ধশিষ্যদের জাতিভেদের কঠোর বিরোধীতা করতে দেখা যায়।

একসময় আয়ুষ্মান মহাকচ্চান মথুরার নিকটে বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন। মথুরার রাজা অবন্তিপুত্র মহাকচ্চানের কীর্তি শুনেছিলেন। তাই অনেক লোকজনকে সাথে নিয়ে তিনি তার কাছে উপস্থিত হলেন। অবন্তিপুত্র মহাকচ্চানকে জিজ্ঞেস করলেন, " হে কাত্যায়ণ, ব্রাহ্মণ বর্ণই শ্রেষ্ঠ, অন্য বর্ণ হীন, ব্রাহ্মণ বর্ণই শুক্ল, অন্য বর্ণ কৃষ্ণ; ব্রাহ্মণরাই মুক্তি পায়, অন্য বর্ণ পায় না; ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদেবের মুখ হতে উৎপন্ন হয়েছে এবং ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মদেবের ঔরসপুত্র- ব্রাহ্মণরা এসব কথা বলে থাকেন। এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

কাত্যায়ণ- হে মহারাজ, এটা শুধুমাত্র একটা বুলি। মনে করুন, কোনো ক্ষত্রিয় ধনধান্যে কিংবা রাজ্যে সমৃদ্ধ হল, তাহলে চার বর্ণের মানুষই কি তার সেবা করবে না?

রাজা- হে কাত্যায়ণ, চার বর্ণের লোকই তার সেবা করবে।

কাত্যায়ণ- তেমনি অন্য কোনো বর্ণের মানুষও যদি ধনধান্য ও রাজ্যে সমৃদ্ধ হয় তাহলে চার বর্ণের লোকেরাই কি তার সেবা করবে না?

রাজা- চার বর্ণের লোকই তার সেবা করবে।

কাত্যায়ণ- তাহলে চার বর্ণের মানুষই সমান বলে প্রমাণিত হল, তাই নয় কি?

রাজা- এভাবে দেখলে চার বর্ণের মানুষেরাই পরস্পর সমান। তাদের মধ্যে কোনো ভেদ আমার চোখে পড়ছে না।

কাত্যায়ণ- এই জন্যই আমি বলি যে, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, ব্রাহ্মণদের এই মত কেবল একটা বুলি। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের লোকই যদি প্রাণিহত্যা প্রভৃতি পাপ করে তাহলে তাদের একই রকম দুর্গতি হবে, মহারাজ কি এমন মনে করেন না?

রাজা- চার বর্ণের মধ্যে যেকেউ কোনো পাপ করলে সমান দুর্গতি প্রাপ্ত হবে।

কাত্যায়ণ- আচ্ছা মহারাজ, এমন অবস্থায় চার বর্ণই সমান বলে আপনার মনে হচ্ছে না কি?

রাজা- এভাবে দেখলে চার বর্ণের মানুষেরাই পরস্পর সমান। তাদের মধ্যে কোনো ভেদ আমার চোখে পড়ছে না।

কাত্যায়ণ- চার বর্ণের মধ্যে যেকোনো বর্ণের মানুষ যদি প্রাণীহত্যা প্রভৃতি পাপ থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের মধ্যে কেউ কি স্বর্গে যাবে না?

রাজা- এদের সকলেই স্বর্গে যাবে বলে আমার মনে হয়।

কাত্যায়ণ- এই জন্যই আমি বলে থাকি, ব্রাহ্মণ বর্ণই শ্রেষ্ঠ, একথা কেবলই একটা বুলি। হে মহারাজ, মনে করুন, আপনার রাজ্যের চার বর্ণের মধ্যে কোনো বর্ণের মানুষ যদি সিঁধকাটা, লুঠকরা, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি অপরাধ করে এবং রাজপুরুষেরা তাকে ধরে আনে, তাহলে আপনি তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দেবেন কি?

রাজা- সে যদি বধের যোগ্য হয়, তাহলে আমি তাকে বধ করব। যদি সে জরিমানার যোগ্য হয়, তবে তাকে জরিমানা করা হবে। আর সে যদি নির্বাসনের যোগ্য হয়, তাহলে তাকে দেশ থেকে বের করে দেব; কেননা এখন সে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র নয়, সে কেবলই একজন অপরাধী।

কাত্যায়ণ- তাহলে চার বর্ণই সমান নয়কি?

রাজা- এভাবে দেখলে চার বর্ণকেই সমান বলে মনে হয়।

কাত্যায়ণ- মনে করুন, চার বর্ণের মধ্যে কোনো এক বর্ণের মানুষ পরিব্রাজক হল এবং সদাচার পালন করতে থাকল। তাহলে আপনি তার সাথে কেমন ব্যবহার করবেন?

রাজা- আমি তাকে বন্দনা করব, তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেব ও তার প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দেব, কারণ সে এখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নয়, সে এখন কেবলই শ্রমণ নামে পরিচিত।

কাত্যায়ণ- তাহলে কি চার বর্ণই সমান বলে প্রমাণিত হল না?

রাজা- এইভাবে দেখলে চার বর্ণকেই সমান বলে মনে হয়।

কাত্যায়ণ- এইজন্যই আমি বলি, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, একথা কেবলই একটা বুলি।

রাজা- হে কাত্যায়ণ, আপনার উপদেশ খুবই সুন্দর, যেমন উপুর করা পাত্র কেউ সোজা করে রাখে, কেউ ভুল রাস্তায় হারিয়ে গেলে যেমন কেউ তাকে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেয়, অন্ধকারে মানুষ দেখতে না পেলে যেমন কেউ মশাল জ্বেলে দেয়, তেমনি মাননীয় কাত্যায়ণ অনেকভাবে আমাদের ধর্মোপদেশ দিলেন। এইজন্য আমি মাননীয় কাত্যায়ণের, ধর্মের ও ভিক্ষুসংঘের শরণ নিচ্ছি। আমি আজ হতে মৃত্যু পর্যন্ত আপনার ভক্ত হলাম।

কাত্যায়ণ- মহারাজ, আমার শরণ নেবেন না। আমি যে ভগবানের আশ্রয় নিয়েছি সেই ভগবানের আশ্রয় আপনি নিন।

রাজা- হে কাত্যায়ণ, সেই ভগবান কোথায় আছেন?

কাত্যায়ণ- সেই ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করেছেন।

রাজা- সেই ভগবান যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে আমরা তার দর্শনের জন্য শত যোজন দূরে হলেও যেতাম। কিন্তু তিনি পরিনির্বাণ লাভ করলেও আমরা সেই ভগবানের আশ্রয় নিচ্ছি, তার ধর্ম ও ভিক্ষু সংঘের আশ্রয় নিচ্ছি। আজ হতে মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাদের শরণাগত উপাসক হলাম।

[সুত্তপিটক/ মজ্ঝিমনিকায়/মধুরসুত্ত]

জাতিভেদের করাল গ্রাস

উল্লেখিত দৃষ্টান্তগুলোর দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে, বৌদ্ধভারতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ এবং তার ভিক্ষুরা বেশ বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলেছিলেন। বুদ্ধের ধম্ম জাতিভেদের নিষ্পেষণ থেকে অনেক নিপীড়িতকেই মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধের পূর্বেই জাতিভেদ জেঁকে বসেছিল, ভারতের নানান প্রান্তকে জাতিভেদ গ্রাস করে নিয়েছিল। তাই বুদ্ধ এবং বৌদ্ধদের এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ হতে জাতিভেদ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ভারতবর্ষকে আরো অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

সহায়ক গ্রন্থঃ ১) ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ত্রিপিটক ২) ভগবান বুদ্ধ- ধর্মানন্দ কোসম্বী

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ লেখাটিতে ধর্মানন্দ কোসম্বীর ‘ভগবান বুদ্ধ’ বইটির ভীষণ রকম সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এই লেখার একটা বড় অংশ কেবলমাত্র কোসম্বীর গ্রন্থের লেখার সাধু থেকে চলিততে রূপান্তর। তাই কোসম্বীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি।

এই লেখাটির সম্পাদনা করেছেন, ‘শুদ্ধবুদ্ধি’।

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন দ্বন্দ্ব

-নন্দিনী বিশ্বাস

সম্প্রতি ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা হয়ে গেছে প্রায়, প্রচুর রকেট ছোড়া হচ্ছে, প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে, শিশুরাও বাদ নেই। পুরো পৃথিবী এখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ভারতেও তাই। কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হলো, তা আমি যথাসম্ভবভাবে নিরপেক্ষ এবং সংক্ষেপে গল্পের আকারে বলার চেষ্টা করছি। এটা আমার প্রথম লেখা, তাই কোনো ভুল হলে রিভিউতে ধরিয়ে দেবেন।

ম্যাপ দেখলে বুঝতে পারবেন, ইজরায়েলের পূর্বের একটা অংশকে ওয়েস্ট ব্যাংক বলে, আর বাদিকে নিচের ছোট একটি অংশকে গাজা বলে। এই গাজাতে ও ওয়েস্ট ব্যাংকের শতাধিক টুকরো টুকরো অংশে প্যালেস্টাইনিদেরর বসবাস, আর বাকি ওয়েস্ট ব্যাংকে ইজরায়েলিদের বসবাস। এবার কথা হলো এইভাবে টুকরো টুকরো ভাবে থাকে কি করে একটা দেশ? এর জন্য আমাদের ইতিহাসে যেতে হবে।

হিটলার ইহুদিদের উপরে কিরকম অত্যাচার করেছিল সেটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু এটা আরও পুরোনো, কিছু খ্রিস্টানদের মতে যীশু খ্রিস্টকে মেরেছিল ইহুদিরা (যীশু খ্রিস্টের অস্তিত্ব সত্যি ছিল কিনা সেটা অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল), তাই সেখান থেকেই খ্রিস্টানদের ইহুদিদের প্রতি ঘৃণার শুরু। ইহুদিদের নামে অনেক গুজব রটানো হতো এবং সাথেই কিছু হত্যাও। পরে ইহুদিরা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে গেলেও ওদের আলাদা জাতি হিসাবে দেখা হতো। তখন ইহুদিরা ভাবলো এরা সবাই আমাদের আলাদা হিসাবে দেখে, কোনোদেশ নিজেদের আপন করে দেখে না আমাদের, আমাদের নিজেদের একটা দেশ বানাতে হবে। একটি ইহুদীরাষ্ট্র।

তাই প্রচুর ইহুদিরা প্যালেস্টাইনের অঞ্চলে এসে বসবাস করা শুরু করে। এবার প্যালেস্টাইনই কেন? কারণ ইহুদিদের কাছে এটি পবিত্র জায়গা, জেরুসালেম তাদের কাছে সবথেকে পবিত্র স্থান। তখন কোনো ইজরায়েল, ওয়েস্ট ব্যাংক, গাজা ছিল না। পুরোটাই প্যালেস্টাইন ছিল আর সেটা অটোমান সাম্রাজ্য ছিল, যেখানে খৃস্টান, মুসলিম, ইহুদিরা শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে বসবাস করতো, কারণ জনসংখ্যা কম ছিল।

এরপরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন অটোমান সাম্রাজ্যকে পরাস্ত করে প্যালেস্টাইনে নিজেদের শাসন শুরু করে। এরই মধ্যে জার্মানিতে হিটলার লক্ষাধিক ইহুদির গণহত্যা হয়, তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য কিছু ইহুদিরা আমেরিকা পালিয়ে যায় কিছু ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে যায়। প্রথমে ব্রিটিশরা ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে আসতে দিলেও পরে বাধাদান করে। এর কারণে একটা ইহুদিরা নিজেদের দেশ তৈরির দাবিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, আর তার পরপরই প্যালেস্টাইনিরাও তাদের নিজেদের দেশের দাবিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করে।

এরপরে ব্রিটিশ প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে যায়, আর ইহুদি আর প্যালেস্টাইনিদের নিজেদের দেশ বানাতে দেয়, কিন্তু কে কোন জায়গা পাবে এইটা ঠিক করার দায়িত্ব পড়ে UN এর। UN ওয়েস্ট ব্যাংক আর গাজাকে

প্যালেস্টাইনকে দেয়, আর বাকিটা ইজরায়েলকে, আর ওয়েস্ট ব্যাংক এর ভিতরে জেরুসালেম শহর যেটা খ্রিষ্টান, মুসলিম ও ইহুদি তিন ধর্মের কাছেই পবিত্র শহর, এটা আন্তর্জাতিক কন্ট্রোলে থাকবে। ইহুদিরা তাদের অংশ নিয়ে যে দেশটি বানায় তারই নামকরণ করে ইজরায়েল।

কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো সেটা মেনে নেয়নি, ওরা বলে ইহুদিদের একটুও জায়গা দেওয়া যাবে না। এইভাবেই 1948 সালে শুরু হয় প্রথম আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ(আসেপাশের দেশগুলি আরবের কন্ট্রোলে ছিল), পাঁচটা দেশ একটা ছোট নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইহুদিরা কয়েক বছর আগেও দেখেছে সারা পৃথিবী তাদের কোন নজরে দেখে, হিটলার জার্মানিতে কিরকম ব্যবহার করেছে, আর এখন সব আরবদেশ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের বেঁচে থাকতে হলে যুদ্ধ করতে হবে। 1949তে তারা এই যুদ্ধটা জিতে যায় এবং দেখা যায় UN এর পূর্ববর্তী ম্যাপের প্যালেস্টাইনের অনেক অংশ ইজরায়েল দখল করে নেয়, গাজা মিশরের আন্ডারে চলে যায় আর ওয়েস্ট ব্যাংক জর্ডানের আন্ডারে। প্যালেস্টাইনিদের নিজেদের কাছে আর কিছু থাকে না। লক্ষাধিক প্যালেস্টাইনিদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে আরব দেশে শরণার্থী হতে হয়।

1967 এ সংগঠিত হয় দ্বিতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ। এটাও ইজরায়েল জেতে তাতে শুধু তারা গাজা আর ওয়েস্ট ব্যাংকের দখল নেয় তাই না, ইজরায়েলের পাশে মিশরের যে বড় উপদ্বীপ, সেটাও দখল নিয়ে নেয়। প্যালেস্টাইনিরা নিজেদের দেশ গঠন করার উদ্দেশ্যে 1964 সালে গঠন করে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা PLO, প্রথম দিকে এরা অস্ত্র ব্যবহার করে নিজেদের দেশ পেতে চায়, ইজরায়েলের কোনো অস্তিত্বই রাখতে চায়না। এইসব বিভিন্ন কারণে PLOকে জঙ্গি বলে ঘোষণা করে ইজরায়েল ও আমেরিকা। 1974 এ UN PLO কে স্বীকৃতি দেয় যে এরা প্যালেস্টাইনিদের প্রতিনিধি দল হিসেবে।

1979 এ মিশর ও ইজরায়েল নিজেদের মধ্যে ঝামেলা মিটিয়ে নেয় এবং মিশর প্রথম আরবদেশ যা ইজরায়েলকে একটা দেশ হিসেবে মেনে নেয়, এর বদলে ইজরায়েল তাদের দখলে রাখা মিশরের উপদ্বীপ মিশরকে ফেরত দেয়। কিন্তু এর দুবছরের মধ্যে মিশরের কট্টরপন্থীরা মিশর রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে দেয় ইজরায়েলের সাথে সমঝোতা করায়।

এরই মধ্যে ইজরায়েলিরা ওয়েস্ট ব্যাংকে গিয়ে পার্মানেন্ট কলোনি বানিয়ে থাকা শুরু করে, যেটাকে ইজরায়েলি সরকার সমর্থন করে, কট্টর ইজরায়েলিরা মনে করে ওয়েস্ট ব্যাংকও তাদের তাই তাদের অধিকার আছে এসবের। আন্তর্জাতিকভাবে এটাকে বেআইনি বলা হয়।

1992 তে ইজরায়েলি রাষ্ট্রপ্রধান Yitzhak rabin প্রথমবার বলেন PLO জঙ্গিসংগঠন নয়, তারা শুধু নিজেদের দেশ চায়। তখন ইজরায়েল PLO কে স্বীকৃতি দেয় আর PLOও ইজরায়েলকে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তারপরে দুইপক্ষ আলোচনা করে ভাগ বাটোয়ারা করে 1994 এ প্যালেস্টাইন দেশ গঠন করা হয়। কিন্তু এরমধ্যে ইজরায়েলিরা ইজরায়েল সরকারের সমর্থনে ওয়েস্ট ব্যাংকের প্রচুর জায়গায় নিজেদের পার্মানেন্ট কলোনি বানিয়ে থাকা শুরু করেছে। এখন প্যালেস্টাইন দেশটা হলেও বিক্ষিপ্তভাবে হয়। ঠিক করা হয়, গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাংকের

কিছু অংশ প্যালেস্টাইন সরকারের কিছু অংশ ইজরায়েল সরকারের, কিছু অংশ দুই সরকার যৌথভাবে চালাবে। যখন ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে সম্পর্ক একটু একটু করে ভালো হচ্ছে, তখন কিছু কট্টর ইহুদিরা 1995তে ইজরায়েলের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে। তাদের মতে তারা কেন প্যালেস্টাইনের সাথে সমঝোতা করবে, পুরোটাই ইজরায়েল চাই।

এর কিছু আগে 1987 এ প্যালেস্টাইনে কিছু ইসলাম কট্টরবাদীরা হামাস দল গঠন করে। এদের মতে PLO উদারপন্থী। আমরা পুরো ইজরায়েলকেই চাই প্যালেস্টাইনের ভিতরে। এরাও দুই দেশের ওই সমঝোতাকে মেনে নেয়নি, ভোট বয়কট করে, এমনকি ইজরায়েলে সুইসাইড বম্বিং ও করে। এইভাবে দুপক্ষে আবার কট্টরপন্থীরা বাড়তে থাকে, সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে, আর দুই তরফেরই প্রচুর মানুষ মারা যেতে থাকে। ইজরায়েল তাদের ওয়েস্ট ব্যাংকের কলোনিগুলোর চারপাশে দেওয়াল বানিয়ে সিকিউরিটি গার্ড দিয়ে, চেক পয়েন্ট বসিয়ে দেয়।

এর মধ্যে 2006 এ হামাস প্যালেস্টাইনে ভোটে অংশগ্রহণ করে জিতে যায় PLO এর রাজনৈতিক দল ফাতাহ এর বিরুদ্ধে অল্প কিছু ভোটের ব্যবধানে। কিন্তু 2007 এ ফাতাহ আর হামাসের মধ্যে প্যালেস্টাইনে গৃহযুদ্ধ হয়, একে ব্যাটেল অফ গাজা বলা হয়। প্যালেস্টাইন দেশ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। গাজা হামাসের দখলে থাকে আর ওয়েস্ট ব্যাংকের প্যালেস্টাইন ফাতাহ আর PLO এর শাসনে থাকে। যত ঝামেলা এখন দেখা যায় তা সবই গাজাতে উগ্রপন্থী হামাসের দ্বারা। PLO শাসিত প্যালেস্টাইন তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ এলাকা।

পশ্চিম জেরুসালেম ইজরায়েলের অন্তর্ভুক্ত আর পূর্ব জেরুসালেম আন্তর্জাতিকভাবে প্যালেস্টাইনের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সেটা ইজরায়েল দখল করে রেখেছে। ইজরায়েলের মতে জেরুসালেম পুরো তাদের আর প্যালেস্টাইনের মতে তাদের। আগেই বলেছি গাজা হামাস শাসিত, এর উপরে প্যালেস্টাইন সরকার বা PLO এর হাত নেই। ইজরায়েল, আমেরিকা, জাপান, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মতে হামাস জঙ্গিদল। ইংল্যান্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মতে হামাসের কিছু অংশ জঙ্গি। কিন্তু চীন, রাশিয়া, টার্কি, ইরান, নরওয়ের মতো দেশের মতে হামাস জঙ্গি নয়। ইজরায়েল আর হামাস একে অপরের দিকে প্রায় রকেট ছুড়তে থাকে, যদিও ইজরায়েলের আয়রন ডোম থাকার কারণে হামাসের রকেট আক্রমণের থেকে ইজরায়েলকে রক্ষা করে। ওয়েস্ট ব্যাংকে কোনো রকেট ছোড়াছুড়ি হয়না, কারণ ওর মাঝে ইজরায়েলি কলোনিও আছে। অপরকে গাজাকে ইজরায়েল ও ওপাশে মিশর পুরোপুরি ব্লক করে রেখেছে, তাই গাজার অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো না, প্রচুর বেকারত্ব। যা টাকা আছে অন্যান্য দেশ থেকে আসে, আর হামাস তার বেশির ভাগ অস্ত্র ও রকেটের পিছনে খরচ করে।

এবার চলে আসি বর্তমান ঘটনার প্রসঙ্গে, পূর্ব জেরুসালেমে কট্টর ইজরায়েলিরা তাদের রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে deaths to arab বলে rally করে। প্যালেস্টাইনিরাও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, যাতে তারা পাথরও ছোড়ে, ইজরায়েলি পুলিশ অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। এরপরে ইজরায়েলি পুলিশ আল আকসা মসজিদে ঢুকে, যেসব প্যালেস্টাইনিরা ওখানে প্রার্থনা করছিল তাদের উপরে আক্রমণ করে রাবার বুলেট ও গ্রেনেড ছুড়ে। ইজরায়েলি পুলিশের দাবি তারা খবর পেয়েছিল ওই মসজিদে প্যালেস্টাইনিরা পাথর জড়ো করছিল death to arab এর rally এর উপরে হামলা করার জন্য। এইসব শুনে গাজার হামাসরা ইজরায়েলকে

হুমকি দেয়, ইজরায়েলি পুলিশদের আল আকসা মসজিদ ছাড়তে নাহলে ইজরায়েলে হামাস রকেট ছুড়বে। যদিও ওয়েস্ট ব্যাংকের সাথে গাজার হামাসের সম্পর্ক নেই সেরকম, তবুও প্যালেস্টাইনি হওয়ার জন্য বলে আর কিছু পরে রকেট ছোড়াও শুরু করে দেয়। তখন ইজরায়েলও গাজাতে রকেট ছোড়া শুরু করে দেয়। এতে প্রচুর প্যালেস্টাইনি মানুষ মারা যায় শিশুরা শুদ্ধ। ইজরায়েলেও কয়েকজন মারা গেছে কিন্তু সংখ্যাটা গাজার তুলনায় কম আয়রন ডোম থাকায়।

এবার কে সঠিক? সবাই যে যার পক্ষে যুক্তি দেবে। ইতিহাসে চলে যাবে। এখানে আমি আমার মতটাই বলি, ইজরায়েল যেভাবে প্যালেস্টাইন দখল করে রেখেছে প্যালেস্টাইনিদের উপরে অত্যাচার করেছে, দেশছাড়া করেছে তাতে তারা অপরাধ করেছে, কিন্তু তার বদলে গাজা যে রকেট ছুড়ছে সেটাও ঠিক না, হিংসার পরিবর্তে হিংসা হয়ে সম্পর্ক দিনদিন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে, এরা একে অপরকে জঙ্গি হিসাবে দেখছে, ঘৃণা করছে। ইজরায়েলও প্রতিহিংসার বশে গাজাতে রকেট ছুড়ছে সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে, বাচ্চারাও। ইজরায়েল পৃথিবীর অন্যতম সামরিকশক্তি গুলির মধ্যে একটি, তাদের সাথে পেরে ওঠা অসম্ভব গাজার হামাসের কাছে।

এখন সমাধান কী হবে? অনেকের মতে 1994 এর হিসাবে দুই দেশে বিভক্ত করা হোক, অনেকের মতে UN এর ম্যাপ হিসাবে বিভক্ত হোক দেশ। সেটা হলে ইজরায়েল যেসব পার্মানেন্ট কলোনি বানিয়েছে প্যালেস্টাইনে যেখানে স্কুল, হসপিটাল, বাড়ি, বড় বড় রাস্তা সবই আছে, প্যালেস্টাইন অন্তর্ভুক্ত হলে ওই কলোনিগুলোর কি হবে! আমার মতে ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনকে এগিয়ে এসে শান্তি ঘোষণা করা উচিত 1994 এর মতো। নাহলে যুদ্ধই হয়ে যাবে সাধারণ মানুষের প্রাণ যাবে, জীবন নরক হবে।

যে ব্যক্তি বাস্তবিকই নিদ্রিত তাহাকে জাগান সহজ ব্যাপার, কিন্তু যে লোক ঘুমাইবার ভান করিয়া বাস্তবিক পক্ষে জাগ্রত আছে তাহাকে ঠেলিয়া তোলবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

— মেঘনাদ সাহা (ভারতবর্ষ, ২৭ বর্ষ, চৈত্র ১৩৪৬, ইং ১৯৪০)



মাউন্ট রাধানাথের খোঁজে

- সুকৃতি দাস

সালটা ছিল ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ। দার্জিলিঙে তখন উত্তর- পূর্ব ভারতের পর্যবেক্ষণের কাজ চলছে। একদিন সকালবেলা কলোনেল অ্যান্দ্রিউ স্কটের অফিসে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন একজন ভারতীয় পরিগণক। তিনি প্রবেশ করা মাত্রই স্বউল্লাসে চেঁচিয়ে বললেন -" স্যার! আমি পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত খুঁজে পেয়েছি। "
প্রথমে স্কট নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। কারণ তখন কাঞ্চনজঙ্ঘাই ছিল পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত। তিনি ওই ভারতীয় পরিগণকের কাছে বিশদে এই বিষয়ে জানতে চাইলেন। তখন ওই ভারতীয় পরিগণক ওনার সামনে মেলে ধরলেন তার গণনার হিসাব। নিপুণ এই গণনা অনুযায়ী ওই উচ্চতম মাউন্টেনের উচ্চতা হল ২৯০০০ ফুট যা কাঞ্চনজঙ্ঘার থেকে অনেকবেশি। কিন্তু স্কট এই উচ্চতার সাথে আরও ২ ফুট যোগ করে প্রকাশ করলেন এই মানকে আরো বিশ্বাসযোগ্য বানানোর জন্য।
১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হল এই পর্বতের কথা। স্কট এই পর্বতের নাম দিলেন তার পূর্বসূরি কলোনেল এভারেস্টের নাম অনুসারে মাউন্ট এভারেস্ট। সম্মান ঝাঁপিয়ে পড়ল স্কটের উপর। ওই বছরই রয়্যাল জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটি তাকে ভূষিত করলেন স্বর্ণ পদক দিয়ে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি নির্বাচিত হলেন রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হিসাবে। কিন্তু যিনি প্রথম এই পর্বতের উচ্চতা গণনা করেছিলেন। সেই ভারতীয় পরিগণকের নাম রয়ে গেল অন্ধকারে।

কিন্তু কে ছিলেন এই ভারতীয় পরিগণক ?

তিনি হলেন রাধানাথ শিকদার। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিতুরাম শিকদার এবং দেবকী শিকদারের কোল আলো করে জোড়াসাঁকোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিযুক্ত গণিতবিদ রাধানাথ শিকদার।
যে কৈশোরে কিশোরদের হাতে শোভা পায় ডাঙ্গুলি আর ঘুড়ি। সেই সময়ে তিনি ডুবে থাকতেন ইউক্লিডের জ্যামিতি, থমাস জেম্পনের অ্যানালাইটিকাল জ্যামিতি, ওয়াইন্ডহাউসের অ্যাস্ট্রোনমি বইয়ের পাতায়। সেই বয়সেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন দুটি বৃত্তের সাধারণ স্পর্শক আঁকার নয়া পদ্ধতি।

কর্মক্ষেত্রের শুরু

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে কলোনেল জর্জ এভারেস্ট হন্যে খুঁজছিলেন এমন এক গণিতবিদকে যার কাছে স্ফেরিক্যাল ত্রিকোনামিতি একদম জলভাতের মতো পরিষ্কার। গ্রেট ট্রিগোনামেট্রিক সার্ভের দ্বারা ভারত ও ভারত সংলগ্ন অংশের নিপুণ পরিমাপ করার জন্য এমন গণিতবিদের বিশেষ প্রয়োজন পড়েছিল। অবশেষে অধ্যাপক জন

টাইটেলার তাকে হদিস দিলেন তার ছাত্র রাধানাথ শিকদারের। এরপর তার পরামর্শ মতো রাধানাথকে পরিগণকের কাজে নিযুক্ত করলেন জর্জ এভারেস্ট।

প্রথমে কাজের সূত্রে তাকে পাঠানো হল দেরাদুনে। সেখানে তিনি তার কাজের মাধ্যমে মুগ্ধ করে দিলেন সবাইকে। তিনি তার গণনার কাজে প্রথাগত গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করতেন না। তার নব্য আবিষ্কৃত গণনা পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তিনি খুব দ্রুত আর নির্ভুলভাবে করে দিতেন সব গণনার কাজ।

১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে জর্জ এভারেস্টের পরিবর্তে কাজে নিযুক্ত হলেন অ্যান্দ্রিউ স্টার্ট। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে একজন ত্রিরিশ টাকা বেতনভোগী পরিগণক থেকে রাধানাথ শিকদারকে উন্নীত করা হল প্রধান পরিগণকের পদে। তিনি হলেন আবহাওয়া দপ্তরের অধীক্ষক। সেই সময় কলোনেল অ্যান্দ্রিউ স্টার্টের নির্দেশে তিনি পর্বতের উচ্চতা গণনার কাজ শুরু করলেন এবং তিনি গণনা করলেন উচ্চতম পর্বত মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

রাধানাথ শিকদার শুধু একজন গণিতবিদ ছিলেন না। তার জনহিতকর কাজের বহু নিদর্শন রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

ম্যাজিস্ট্রেট ভ্যান্সিটারটের অত্যাচারে নিষ্পেষিত অসহায় সার্ভে শ্রমিকদের কষ্টে কেঁদে উঠেছিল তার মন। তিনি এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিলেন স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে। তার জন্য শাস্তিস্বরূপ তাকে দিতে হয়েছিল ২০০ টাকা জরিমানা। সেই সময় তার মাসিক রোজগার ছিল মাত্র ৩০ টাকা।

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধু প্যারিচাঁদ মিত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে শুরু করেছিলেন মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি প্রচার করেছিলেন নারীশিক্ষার কথা।

জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশনের (বর্তমানে স্কটিশ চার্জ কলেজ) শিক্ষক হিসাবে। অবশেষে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চলে গেলেন অমৃতলোকে।

২০০৪ সালে তাঁর নামাঙ্কিত পোস্টাল স্ট্যাম্প ঘোষণা করেছিল ভারত সরকার। কিন্তু জীবিতকালে সেই অর্থে সম্মান পায়নি তার অবিস্মরণীয় প্রতিভা।

হয়ত ভারতবর্ষ সেই সময়ে স্বাধীন থাকলে আজকে মাউন্ট এভারেস্টের নাম হত - মাউন্ট রাধানাথ।

তথ্যসূত্র - উইকিপিডিয়া

প্রেম, যৌনতা এবং..

- অভিষেক দে

একজোড়া নারী- পুরুষের ভেতর প্রেম বা ভালোবাসা মোটেই অপরাধ,বে-আইনি কিংবা নোংরামো নয়। বরং সুস্থ, স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রেমের কিছু পূর্ব-শর্ত আছে। যেমন বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা,মতাদর্শগত মিল এবং স্বনির্ভরতা।

দু-জন মানুষের ভেতর প্রেম, ভালোবাসা থাকলে যৌনতা কিংবা দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা কিংবা সেই সম্পর্কে যাওয়া টা মোটেই অপরাধ কিংবা নোংরা মানসিকতার লক্ষণ নয়। কারণ,প্রেম থাকলে যৌনতাও থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেটা অবশ্যই হবে দু-জনের সম্মতিতে। কখনই জোর করে নয়। জোর করে দৈহিক সম্পর্কে যাওয়া ধর্ষণের সামিল। যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর শাস্তি আজীবন জেল কিংবা সোজা ফাঁসি। যৌনতাকে বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন নোংরা, অতি-গোপনীয় কিছু। এটা অবশ্যই শূচিবাতিকগ্রস্ততা,যা একটা মানসিক রোগ।

তন্ময় এবং মেঘনা দ-ুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তমনস্ক তরুণ-তরুণী। দু-জনেই চাকুরীজীবী। দু-জনের ভেতর প্রেম এবং সেখান থেকে একসময় বিয়ে। দু-জনের যৌনজীবন টাও স্বাভাবিক ছন্দেই চলছিল। এরই মধ্যে জন্ম নেয় মেঘনা এবং তন্ময়ের কন্যা সন্তান। বর্তমানে কন্যার বয়স পাঁচ। কয়েকবছর সব ঠিকঠাক থাকার পর আচমকা দু-জনের সম্পর্কে চিঁড় ধরে। সামান্য ছোট খাটো বিষয়েও প্রায়শই মনোমালিন্য এবং শেষে ঝগড়া। সব তো প্রথম থেকে সুন্দর ছন্দেই চলেছিল, তাহলে হটাৎ কি এমন হলো যাতে দু-জনের ভেতর আজ মতের এবং মনের অমিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে? আসুন মুক্তমনে উত্তর খুঁজি।

মেঘনার বক্তব্য : " তন্ময়ের কোনো চয়েস বা পছন্দ বলে কিছু নেই। কিসব যে হিজিবিজি,উল্টোপাল্টা রঙের শাড়ি,কসমেটিক্স কিনে আনে। বাধ্য হয়ে ফের দোকানে ওকে পাঠাতেই হয় পালটে আনতে। আমি কি ধরনের শাড়ি কিনি,কী জুয়েলারি, কসমেটিক্স ব্যবহার করি সেসবের খবরও রাখেনা। সে কথা বললেই আবার বাবুর রাগ হয়।যত্তসব,হুঁ। মেয়েটা যে বড় হচ্ছে সেদিকে বাবুর যেন ধ্যান নেই। আজকাল হটাৎ করেই তেনার খিদে জেগে ওঠে। এই তো সেদিনের ঘটনা, রান্না করছি আর উনি পেছন থেকে এসে কোমড় জরিয়ে গালে একটা চুমু। দিয়েছি খুন্তি দিয়ে সলিড একটা। বুড়ো বয়সে ভিমরতি "।

মেঘনার উদ্দেশ্যে বলা যায় : আপনার বর না হয় একটা উল্টোপাল্টা শাড়ি কিংবা কসমেটিক্স, জুয়েলারি কিনে এনেছেন, এবং সেটা হয়তো আপনার অপছন্দই হলো। কিন্তু সেটার জন্য আপনি তন্ময় বাবুকে যে কয়েকটা কড়া কথা শোনালেন সেটা কি ঠিক হলো? উনি কিন্তু আপনার জন্য খুশি মনেই শাড়ি ইত্যাদি কিনেছেন। আপনি যদি হেসে বলতেন ' খুব সুন্দর হয়েছে ' তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো? না হয় উনাকে পরে একটু রসিকতার ছলেই বোঝাতেন যে সেটা আপনার ঠিক পছন্দ হয়নি। আপনি উনাকে সঙ্গে করে দোকানে গিয়ে না হয় কিনেই আনতেন আপনার পছন্দসই জিনিষ। এতে আপনার বর ও খুশি হতেন। দেখতেন আগামীদিনে উনি

আপনার পছন্দসই জিনিষ ই ঠিক কিনে এনে দিতেন। একটা ছোট্ট কথা যেখানে ঝগড়ার পরিবর্তে খুশি আনতে পারে, সেখানে কি খুবই প্রয়োজন ঝগড়া করে নিজের এবং অপরের রক্তচাপ বাড়ানোর। মেঘনা, আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখুন তো সত্যি কি আপনি আগের চেয়ে বদলে যাননি? আপনি তন্ময় বাবুকে দুঃখ দিতে চান বলেই কি দুঃখ দিচ্ছেন? আর সেক্স। সেটা আপনিই ভালোই বুঝবেন। এই বিষয়ে কোনো সমস্যা হলে উনাকে ঠান্ডা মাথায় বোঝান যে এভাবে মেয়ের সামনে এইসব দুষ্টুমি না করে রাতে বিছানায় করলে বরং ভালা হয়। অবশ্যই সেটা আপনার সম্মতিতেই, জোর করে নয়। মেঘনা, আপনি কি জানেন একজন সুস্থসবল মানুষ ৬০ বছর বয়সের পরেও যৌনতা কে উপভোগ করতে পারেন? নিশ্চই জানেন না। তাই যৌনতাকে (সেক্স) নোংরামো না ভেবে স্বাভাবিক ভাবে সেটাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন অথবা সরাসরি না বলে দিন বর কে। কিংবা আজ আপনার বরকে পছন্দ না হলে সেটাও সরাসরি জানিয়ে দিন। মনে রাখবেন জোর করে কোনো সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যায়না।

আচ্ছা, মেঘনা আপনি নিশ্চই রান্নার নতুন রেসিপি টা ভালো হয়েছে কিনা বরকে জিজ্ঞেসা করেছেন। বর নিশ্চই আপনার রান্নার তারিফও করেছেন। অপছন্দ হলেও আপনাকে হয়তো খুশি করার জন্য রান্নার প্রশংসা করেছেন। উনি আপনাকে দুঃখ দিতে চাননা তাই মিথ্যেটুকু বলেছেন আর আপনিও পরে খেতে গিয়ে দেখেছেন রান্না ভালো হয়নি।ঝাল বেশি কিংবা নুনের পরিমাণ কম।

তন্ময়ের বক্তব্য : " সেইদিন টা ফিরে পেতে চাই বড্ড বেশি করে যখন আমাদের বিয়ে হয়নি। মানে দু-জনে প্রেম করতাম, সেই কলেজের দিন গুলোতে। কিন্তু কেন? আসলে সেসব দিনে আমাদের ভেতর মনের অমিল ছিলোনা। ছিলোনা মতের অমিলও। কিন্তু আজ সেসব অতীত। মেঘনা আজকাল বড্ড বেশি খিটখিটে হয়ে গেছে হয়ে গেছে। ভালো,খারাপ সবেতেই ঝগড়া করে। এই তো কয়েকদিন আগেকার ঘটনা, বউ কে বললাম অফিসের কয়েকজন কলিগ আসবে, একটা মিটিং করবো বাড়িতে বসে। কিছু স্ন্যাক্স বানিয়ে দাও। উনি মুখ ঝামটা দিলেন। অগত্যা একটা কফি শপে বসেই আলোচনা সারতে হলো। আজকাল উনাকে আদর টাদর করতে গেলেও যেন কোর্ট থেকে পারমিশন নিতে হবে, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে। আসলে সন্দেহ। বুঝলেন সন্দেহ। আমার অফিসের একজন মহিলা কলিগ একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন একটা পেন ড্রাইভে লোড করা কিছু জরুরি ডকুমেন্ট দিতে। তা আমার বউ এর কিভাবে যেন মনে হয়েছে যে ঐ মহিলার সাথে আমি নাকি ফষ্টিনষ্টি করে বেরাচ্ছি। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ যে ওর ভুল ধারনা সেটা বোঝানোই মুশকিল। ইদানীং ওর ঝগড়ুটে স্বভাবের কারনে আমিও পালটা ঝগড়া করি। ওকে জ্বালাই, আনন্দ পাই। মনে মনে বলি, দেখ কেমন লাগে "।

তন্ময়ের উদ্দেশ্যে জানাবো : চোখের বদলা চোখ এবং রক্তের বদলা রক্ত এই নীতি নিয়ে চললে পৃথিবী একদিন মানবশূন্য হবেই।ভাবছেন কেন এমন বলছি? তাহলে শুনুন মশাই, বউ না হয় আপনার কথামতো, কারণে অকারণে ঝগড়া করছেন মানলাম কিন্তু আপনিও তো পালটা ঝগড়ার পথেই যাচ্ছেন। সেটা কি ঠিক কাজ ? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আজ আপনাদের ভেতর যে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে তার পেছনে একটাই কারন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটা হলো আপনার সেই মহিলা অফিস কলিগ। বিশ্বাস বড়ই বেয়াড়া শব্দ। যা গড়তে সময় নেয় কিন্তু ভাঙ্গতে সময় বেশি নেয়না। আপনি নিজেদের সম্পর্ক কে আবার আগের মতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আন্তরিক

হলে কয়েকটা কাজ করুন। উইকএন্ডে সপরিবার বাইরে ঘুরতে বেরান। লাঞ্চ অথবা ডিনার টাও বাইরেই সেরে নিন। আরেকটা দারুণ কাজও করতে পারেন। আপনার কন্যাকে প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে দু-জন মিঞা বিবি মিলে বেরিয়ে পড়ুন কেনাকাটা করতে, সিনেমা দেখতে এবং অবশ্যই বাইরে খেতে। রোমান্টিকতা আনতে ক্যান্ডল লাইট ডিনার ও করতে পারেন। কারণবারি চাখতে চাইলে বউ এর অনুমতি নিয়েই চাখবেন সেখানে। বউ মানা করলে ভুলেও জেদ দেখাবেন না। যেদিন আপনি বাড়িতে থাকবেন, অর্থাৎ অফিসের ছুটি সেদিন অবশ্যই চেষ্টা করুন বাড়ির কাজে বউকে সাহায্য করতে (বউ এর কোমড় জরিয়ে ধরার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে)। সাথে যে মহিলা কে নিয়ে আপনাদের ভেতর অশান্তির আঁচ পাওয়া যাচ্ছে সেটা নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করুন। বউকে সবটা জানান। সম্ভব হলে উনাকে সরাসরি বলুন যেন নিজেই গোয়েন্দাগিরি করে দেখে যে আপনি অন্য মহিলার সাথে কোনো রকমের গোপন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন কিনা।

মনে রাখবেন সুস্থ আলোচনার মাধ্যমেই কিন্ত অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলা সম্ভব। চাইলে কোনো মনোবিদ কিংবা মনোরোগ চিকিৎসক এর পরামর্শও নিতে পারেন। আখেরে লাভ আপনার। আর দৈহিক সম্পর্ক। সেটা নিয়েও বউ এর সাথে খোলাখুলি আলোচনা করুন। উনার অপছন্দ হলে না হয় এড়িয়েই যান আপাতত। উনাকে ঠান্ডা মাথায় বোঝান সেক্স কোনো নোংরামো নয়, বরং দু-জন সুস্থ সবল মানুষের ভেতর সেক্স হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। দেখবেন সব সুন্দর ভাবে মিটে যাবে। একদিন আপনারাই একে অপরকে বলবেন " হ্যাপি ম্যারেড লাইফ "।

ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি!

-রাজা দেবরায়

একজন মানুষের কাজের পরিধি বড় বা ছোট হতে পারে। অনেক ভাগ থাকতে পারে। আমাদেরও একই মানুষের কাজের ভাগগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণেই দেখা উচিত। মনে করুন, একজন লোক অভিনয় করেন, আবৃত্তি করেন, কবিতা লেখেন, রাজনীতি করেন। ধরা যাক, তিনি অভিনয় এবং আবৃত্তি করতে দক্ষ। বাকিগুলোতে তুলনামূলক একটু কম দক্ষ। ধরা যাক, উনাকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে অনেকেই অপছন্দ করেন, অভিনেতা হিসেবে প্রচুর মানুষ পছন্দ করেন, বাচিকশিল্পী হিসেবেও যথেষ্ট জনপ্রিয়। তবে কবি হিসেবে খুব একটা পরিচিতি নেই।

এখন কথা হচ্ছে, মানুষ তো একজনই। উনার কাজের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। এখন অভিনেতার সাথে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বা কবিকে গুলিয়ে ফেললেই সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যাবে। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহলে আর দেখা হবে না। এই ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা থাকতেই পারে অথবা থাকবেই। তুলনামূলক বিশ্লেষণও হবে বা হতেই পারে। কিন্তু দুটো বা তার অধিক কাজের ক্ষেত্রে একই মানুষকে ভিন্ন কাজের নিরিখে একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখলে মূল্যায়নে স্বচ্ছতা থাকবে না।

মূল্যায়ন হতে হবে একটি কাজের ক্ষেত্রের ঐ ব্যক্তি সত্তার নির্দিষ্ট কাজের নিরিখে। অভিনেতা হিসেবে একরকম মূল্যায়ন হবে, রাজনীতিবিদ হিসেবে আরেক রকম মূল্যায়ন হবে, আবার কবি হিসেবে আরেক ধরনের মূল্যায়ন হবে। তবেই সেই মূল্যায়নগুলো স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা সম্ভব হবে। সবগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে মূল্যায়ন হলে উপযুক্ত সম্মান থেকে হয়তো বঞ্চিত হতে পারেন! তবে একই ব্যক্তিকে আলাদা ব্যক্তি সত্তায় দেখাটাও বেশ কঠিন কাজ, রীতিমত নিজেকে সেভাবে শিক্ষিত করতে হবে!!

বেআইনি জ্যোতিষ সম্মেলন

-সন্তোষ শর্মা

ভারতীয় আইনে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বা তন্ত্র-শাস্ত্রের কোনও স্বীকৃতি নেই। জ্যোতিষী বা তান্ত্রিক কোনও আইন স্বীকৃত পেশা নয়। এমনকি, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বা তন্ত্র-শাস্ত্রের চর্চা ও প্রচার 'দ্য ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস অ্যাক্ট, ১৯৫৪'- অনুযায়ী নিষিদ্ধ। অর্থাৎ অ্যাক্ট ১৯৫৪ অনুযায়ী, জ্যোতিষ বা তন্ত্রমন্ত্র চর্চা ও প্রচার করা বেআইনি। এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্যাক্স অন প্রফেশন, ট্রেড, কলিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৯ অনুযায়ী জ্যোতিষ বা তান্ত্রিক পেশা স্মাগলার এবং খুন করা পেশার মতই বেআইনি, তাই সরকারী অডিটোরিয়াম বা প্রেক্ষাগৃহে বেআইনি এই পেশাদারদের সম্মেলন করতে দেওয়াটাও বেআইনি। দেশের যে কোনও স্থানে জ্যোতিষীদের বা তান্ত্রিকদের সম্মেলনের আয়োজন করাও বেআইনি। কিন্তু আজও জ্যোতিষী- তান্ত্রিকের লোকঠকানো বে-আইনী ও বুজরুকির ব্যবসা আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে। জ্যোতিষী- তান্ত্রিকের এই প্রতারক চক্র আবার সম্মেলনের আয়োজন করছে। এর পরেও ধান্ধাবাজ, প্রতারক এই জ্যোতিষী- তান্ত্রিকদের মনের মধ্যে একটি ভয় সব সময় লেগে থাকেই। সেই ভয়ের নাম 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। কারণ, এই যুক্তিবাদী সমিতি'র জন্য প্রতারক জ্যোতিষীদের ও তান্ত্রিকদের রাতের ঘুম উড়ে গেছে। তাই এঁরা কোথাও সম্মেলন করার আগেও গ্রহ-রত্ন, তাবিচ, কবচ, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদিতে বিশ্বাস হারিয়ে পুলিশের উপর ভরসা রাখেন। আজ এমনই একটি ঘটনা লিখছি।

সোমবার ১৩ জানুয়ারী ২০২০

পুরুলিয়া জেলা থেকে প্রতি সোমবার ও বৃস্পতিবার প্রকাশিত সংবাদপত্র 'পুরুলিয়া দর্পণ' –এ জ্যোতিষীদের সম্মেলনের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ১৩ জানুয়ারী প্রকাশিত 'পুরুলিয়া দর্পণ' থেকে আমরা জানতে পারি একটি জ্যোতিষ সংগঠনের ডাকে পুরুলিয়ার নিস্তারিণী মহিলা কলেজ -এ জ্যোতিষ সম্মেলন হতে চলেছে। বিজ্ঞাপনটি এখানে তুলে ধরছি।

অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন

রবীন্দ্রকাডেমির অ্যানুয়াল ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অ্যান্ড কনভোকেসন-২০২০ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১৮ই জানুয়ারী (শনিবার) নিস্তারিণী কলেজের অডিটোরিয়ামে।

দেশ বিদেশের খ্যাতনামা জ্যোতিষী, বাস্তুবিদ, তান্ত্রিক, সাধু ও মহাপুরুষগণের উপস্থিতিতে এক বিরল অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে চলেছে পুরুলিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগ

সাউথ কোলকাতা অ্যাসট্রলজি অ্যান্ড বাস্তু সায়েন্স একাডেমি

পুরুলিয়া শাখা

জ্যোতিষ সম্মেলনের এই বিজ্ঞাপন দেখার পরেই আমরা 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' থেকে সিদ্ধান্ত নিই এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার। কারণ, যে জ্যোতিষ বা তান্ত্রিক পেশার কোনও আইনি স্বীকৃতি নেই। সেই বেআইনি পেশার সঙ্গে জড়িত জ্যোতিষীদের বা তান্ত্রিকদের এবং তাঁদের সংগঠনের সম্মেলনও এক কথায় বেআইনি। তাই পুরুলিয়ার নিস্তারিণী মহিলা কলেজ-এ জ্যোতিষ সম্মেলন বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে আমরা যুক্তিবাদীরা অবশ্যই দাবি জানাব।

বৃহস্পতিবার ১৬ জানুয়ারি ২০২০

১৩ জানুয়ারীর ‘পুরুলিয়া দর্পণ’–এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত জ্যোতিষ ও বাস্তুশাস্ত্রের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৮ই জানুয়ারী নিস্তারিণী কলেজের অডিটোরিয়ামে। তাই যুক্তিবাদী সমিতি সিদ্ধান্ত নেয়, এই বেআইনি জ্যোতিষ সম্মেলনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়ার। কেন এই অভিযোগ ? এর উত্তরে শুক্রবার ২০ ডিসেম্বর, ২০০২-এ ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর তুলে ধরছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা

২০ ডিসেম্বর, ২০০২

পেশাই নয় জ্যোতিষ, বৃত্তিকর দিতে গিয়ে জানলেন জ্যোতিষী

অভিজিৎ ঘোষাল

আইন মানা নাগরিক হিসাবে বৃত্তিকর দিতে গিয়ে তিনি জানলেন, জ্যোতিষচর্চা এই রাজ্যে পেশা হিসাবেই গণ্য নয়। হতবাক তিনি। কারণ, দেশের মানবসম্পদমন্ত্রী মাত্র কিছুদিন জ্যোতিশাস্ত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের আওতায় এনেছেন। অথচ তাঁর কর দেওয়ার আবেদন নাচক করে বৃত্তিকর দফতর বলেছে, জ্যোতিষশাস্ত্রকে পেশা হিসেবে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এই চর্চা দেশের আইন পরিপন্থী। ওই ‘অপরাধ’-এর জন্য জেল ও জরিমানা দুই-ই হতে পারে।

দেশে মনুবাদের ক্রমশ জোরালো হাওয়া উপেক্ষা করে বৃত্তিকর আধিকারিক অশোককুমার দাস-এর নজিরবিহীন নির্দেশে যা বলা হয়েছে, তা বস্তুত জ্যোতিষচর্চা নিয়ে বিতর্কে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। অশোক বাবু লিখেছেন, বৃত্তিকর দেওয়ার আবেদন অনুমোদনের সময় সেটা সংশ্লিষ্ট সমাজে স্বীকৃত আইনসিদ্ধ কিনা সেটা প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য।

তাঁর মতে এই পরীক্ষাতেই জ্যোতিষশাস্ত্র ডাহা ফেল।

তাঁর নির্দেশে অশোকবাবু লিখেছেন, ভারতীয় আইনে জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন স্বীকৃতি নেই। এমনকি, এর চর্চা ও প্রচার ১৯৫৪ সালের ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস অ্যাক্ট অনুযায়ী নিষিদ্ধ। ফলে কনসালটেন্ট বা উপদেষ্টা হিসাবে আবেদন করলেও তাঁর পেশা আইনত গ্রাহ্য নয় - বলে ওই জ্যোতিষীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন অশোক বাবু।

যার বিরুদ্ধে এই রায়, বালিগঞ্জের সেই জ্যোতিষী মণিশংকর দাশগুপ্ত মুখ খুলে বিতর্কে ইন্ধন যোগাতে নারাজ। তাঁর সাফ কথা, কর দিতে ইচ্ছুক নাগরিকের কাছ থেকে দেউলিয়া সরকার যদি কর নিতে না -চায়, তাহলে তাঁর কিছু বলার নেই। তবে যে-বৃত্তি তাঁকে আয়কর দিতে বাধা দেয় না, সেই বৃত্তিকে পেশার মর্যাদা দিতে রাজ্য সরকারের বাধা কোথায়? নির্দেশ হাতে পাওয়ার কয়েক সপ্তাহের পরেও সেটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না। তবে তিনি স্বীকার করেছেন জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উত্তর কলকাতা অ্যাস্ট্রলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্টের যে-সার্টিফিকেট তিনি বৃত্তিকর দফতরে পেশ করেছিলেন, তার আইনি স্বীকৃতি নেই বলে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন অশোকবাবু। মণিশংকরবাবুর বক্তব্য, তাঁদের পেশায় ‘লাইসেন্সসিয়েট সার্টিফিকেট’- এর প্রচলন নেই।

যে পেশার ওপর বহু শিক্ষিত মানুষের আস্থা আছে, সেই জ্যোতিষচর্চাকে কেন তিনি এভাবে নস্যাৎ করলেন ? গোটা বিষয়টি নিয়ে অশোকবাবু মুখে কুলুপ আঁটলেও তাঁর নির্দেশেই পরিষ্কার তাঁর যুক্তি। ১৯৫৪ সালের ওই আইনে দেশের সর্বোচ্চ আইনসভার অর্থাৎ সংসদ এই পেশাকে এইভাবে বর্ণনা করেছে, পেশাটি অনৈতিক, অবাঞ্চিত, বেআইনি, মানুষের সুস্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক ও মনুষ্য সভ্যতার পক্ষে হানিকারক।

বছর পয়তাল্লিশের মণিশংকরবাবু ১০-১১ বছর ধরে মানুষের ভাগ্যগণনাকেই তাঁর জীবিকা করেছেন। মণিশংকরবাবু জানিয়েছেন, কোনও অলঙ্কার বা গ্রহরত্নের দোকানে বসে জ্যোতিষচর্চা করেন না তিনি। ফলে ভাগ্যগণনা ছাড়া অন্য কোনও স্বার্থ নেই তাঁর। কলকাতায় তো বটেই, দিল্লিতেও তাঁর বেশ ভাল পসার। বিদেশেও তাঁর কিছু গুণমুগ্ধ আছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে দু'দিন টানা দেড় ঘণ্টা ধরে জ্যোতিষশাস্ত্র কী ও কেন, বৃত্তিকর আধিকারিকদের সেটা বোঝাতে যে ব্যর্থ হয়েছেন, তা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

এই খবর থেকে দিনের আলোর মত এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, যে জ্যোতিষ পেশার কোনও আইনি স্বীকৃতি নেই। এই বেআইনি পেশায় বৃত্তিকর নেওয়া হয় না। বেআইনি পেশার সঙ্গে জড়িত জ্যোতিষীদের বা তাঁদের সংগঠনের সম্মেলনও এক কথায় বেআইনি। এমন অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী করে একটি জ্যোতিষ সংগঠনকে নিস্তারিণী মহিলা কলেজের অডিটোরিয়ামকে জ্যোতিষ সম্মেলন করার জন্য ভাড়া দেওয়া হল ? বেআইনী এই জ্যোতিষ সম্মেলন বন্ধের দাবিতে যুক্তিবাদী সমিতি'র পুরুলিয়ার জেলা সম্পাদক মধুসূদন মাহাত, জেলা শাসক ও কলেজের প্রিন্সিপালকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠি পাঠকের সামনে তুলে ধরছি।

প্রতিলিপি

প্রিন্সিপাল নিস্তারিণী

মহিলা কলেজ

বিষয়ঃ জ্যোতিষ বুজরুকদের সম্মেলন বন্ধ করার দাবি।

মহাশয়া,

আমরা অর্থাৎ 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সদস্যরা সংবাদপত্র 'পুরুলিয়া দর্পণ' (তারিখ - ১৩ জানুয়ারী, ২০২০) থেকে জানতে পারি যে, আপনার কলেজের অডিটোরিয়ামে জ্যোতিষীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৮ জানুয়ারী, ২০২০, শনিবার। তাই আপনার অবগতির জন্য জানাই যে, দ্য ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস (অবজেকসনেবল এডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪ আইন অনুযায়ী, জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা ও প্রচার করা বেআইনি। এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্যাক্স অন প্রফেশন, ট্রেড, কলিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৯ অনুযায়ী 'জ্যোতিষ' পেশা হিসেবে গণ্য নয়, যেমন পেশাই নয় 'খুন করা' বা 'স্মাগলিং'। এছাড়া জ্যোতিষ শিক্ষার কোন বিধিবদ্ধ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানও ভারতে নেই। জ্যোতিষ একটি অবিজ্ঞান বা বুজরুকি। তাই সরকারী অডিটোরিয়ামে বেআইনি পেশাদার বা বুজরুকদের সম্মেলন করতে দেওয়াটাও বেআইনি।

তাই আপনার প্রতি আমাদের তথা 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' পুরুলিয়া জেলা শাখার সদস্যদের অনুরোধ দয়া করে জ্যোতিষের মত বেআইনি, নিষিদ্ধ, অবাঞ্ছিত, অনৈতিক এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক পেশাদার বা চর্চাকারীদের সম্মেলনের জন্য সরকারী অডিটোরিয়াম ভাড়া বাতিল করে বাধিত করবেন।

বিনীত

মধুসূদন মাহাত,

সম্পাদক

পুরুলিয়া জেলা শাখা

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

প্রতিলিপি –

১) জেলাশাসক, পুরুলিয়া

মধুসূদন মাহাত এই চিঠিটি আমাকেও ওয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর পর ফোন করে বললেন, " সরকারী কলেজের অডিটরিয়ামে জ্যোতিষী নামক বুজরুকদের সম্মেলন বন্ধ করার দাবি জানিয়ে ঐ কলেজে আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐদিন কলেজ বন্ধ থাকায় অভিযোগপত্র জমা দেওয়া যায়নি। কাল সকালে আবার যাবো। " আমি বললাম, " ঠিক আছে। নিস্তারিণী মহিলা কলেজের অডিটোরিয়ামে বেআইনি জ্যোতিষ সম্মেলন বন্ধের দাবি জানানোর পর প্রিন্সিপালের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলে আমাকে জানাও। আমি এই খবরটি মিডিয়াতে প্রকাশিত করার চেষ্টা করবো। "

শুক্রবার, ১৭ জানুয়ারি ২০২০

আজ আবার মধুসূদন মাহাত ও যুক্তিবাদী সমিতি'র উপদেষ্টা জয়ন্ত দাস ঐ সরকারী কলেজে যান। এদিন কলেজ খোলা থাকলেও প্রিন্সিপাল ডঃ ইন্দ্রানী দেবকে কলেজ পাওয়া যায়নি। এরপর কলেজ থেকেই ফোন নং নিয়ে প্রিন্সিপালকে ফোনে ধরেন জয়ন্তবাবু। জয়ন্তবাবু বলেন, " আপনার একটি চিঠি রয়েছে। কিন্তু রিসিভ করার কেউই নেই। একটু ফোন করে বলে দিন যেন চিঠিটা রিসিভ করে নিক। " এরপর প্রিন্সিপাল বলে দেওয়াতে চিঠিটা একজন রিসিভ করেন।

এরপর যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে মধুসূদন নিজে কলেজের প্রিন্সিপালকে ফোন করে প্রশ্ন করলেন, " যেখানে জ্যোতিষ পেশা বেআইনি, সেখানে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত জ্যোতিষীদের সরকারি কলেজের কলেজের অডিটোরিয়াম কী করে ভাড়া দেওয়া হল? যুক্তিবাদী সমিতি'র তরফ থেকে ওই অডিটোরিয়ামে বেআইনি জ্যোতিষ সম্মেলন বন্ধের দাবি জানানো হচ্ছে। চিঠিতে আমরা জানিয়েছি, যেহেতু দ্য ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ (অবজেকসনেবল এডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪ অনুসারে জ্যোতিষ চর্চা ও প্রচার করা বেআইনি। এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোফেসন এন্ড ট্যাক্স অনুযায়ী জ্যোতিষ পেশা স্মাগলার এবং খুন করা পেশার মতই বেআইনি, তাই সরকারী অডিটোরিয়াম বা প্রেক্ষাগৃহে বেআইনি পেশাদারদের সম্মেলন করতে দেওয়াটা বেআইনি। জ্যোতিষীদের সম্মেলন করতে দিলে আগামী দিনে হয়তো পতিতা, স্মাগলার, খুনিরাও সরকারী অডিটোরিয়াম ভাড়া নেবে। "

এই শুনে প্রিন্সিপাল জানালেন, " জ্যোতিষ পেশা বেআইনি নয়। জ্যোতিষ পেশা বেআইনি হলে জ্যোতিষীরা চেম্বার খুলে বসে থাকতে পারতেন না। যদি জ্যোতিষ চর্চা বেআইনি হয়, তাহলে জ্যোতিষীদের পুলিশে ধরত। যদি জ্যোতিষ পেশা বেআইনি হয়, তবে জ্যোতিষীদের এত রমরমা হত না। " এদিকে তিনি নিজেকে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরোধী ব্যক্তি ও নিজেকে একজন বিজ্ঞান মঞ্চের সক্রিয়কর্মী দাবি করেন।

বাহ কেয়া বাত!

এদিকে নিস্তারিণী মহিলা কলেজের অডিটোরিয়ামে বেআইনি জ্যোতিষ সম্মেলন বন্ধের দাবি করে যুক্তিবাদী সমিতি কলেজের প্রিন্সিপাল ও জেলাশাসককে পাঠানো চিঠির উপর ভিত্তি করে দৈনিক 'একদিন' পত্রিকার সাংবাদিক কৃশানু দে'কে দিলাম। এদিকে যুক্তিবাদী সমিতি'র চিঠির প্রতিলিপি সোশাল মিডিয়া ও ফেসবুকে পোস্ট করে দেওয়ায়, তা কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়।

শনিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২০

সকালে স্মার্ট ফোনের ইন্টারনেট অন করে আজ প্রকাশিত 'একদিন'-এর ই-পেপারে সরকারি কলেজের অডিটোরিয়ামে বেআইনি জ্যোতিষ সম্মেলন বন্ধের দাবি নিয়ে খবরটি পড়ছিলাম। খবরটি হল --

একদিন

১৮ জানুয়ারি ২০২০

জ্যোতিষচর্চায় কলেজে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পুরুলিয়ার এক মহিলা কলেজের প্রেক্ষাগৃহে জ্যোতিষ চর্চার আয়োজন করা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এই অভিযোগে শুক্রবার কলেজ কর্তিপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানাল 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র পুরুলিয়া জেলা শাখা। আজ অর্থাৎ ওই প্রেক্ষাগৃহে জ্যোতিষ চর্চার অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। সমিতি প্রশ্ন তুলেছে, কলেজের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানে কিভাবে জ্যোতিষ চর্চার মতো বেআইনি অনুষ্ঠান হতে পারে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক মধুসূদন মাহাত-র তরফে লিখিত এই আবেদন কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস অবজেকসনেবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট আইন ১৯৫৪' অনুয়ায়ী জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চা এবং প্রচার করা বেআইনি।

একটু পরে পুরুলিয়া থেকে মধুসূদন ফোন করে বললেন, " সরকারি কলেজের অডিটোরিয়ামে বেআইনি জ্যোতিষ সম্মেলন বন্ধের দাবি করে আমার লেখা চিঠির কথা জ্যোতিষীদের কানে পৌঁছে গেছে। সম্মেলন শুরু করার আগেই জ্যোতিষীরা আতঙ্কিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চিন্তার কারণ, আমরা যুক্তিবাদীরা ওই জ্যোতিষ সম্মেলনে হাঙ্গামা করতে পারি। যুক্তিবাদী সমিতি'র নেতার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লণ্ডভণ্ড করে না দেয়। এই ভয়ে জ্যোতিষীদের সংগঠক সম্ভবত পুরুলিয়ার মফঃস্বল থানার ওসি সঞ্জয়কুমার চক্রবর্তীর স্মরণাপন্ন হয়েছেন। এরপরই পুরুলিয়ার মফঃস্বল থানার ওসি তাঁর সিভিক ভল্যান্টিয়ারের মাধ্যমে সকাল ১১ টার সময় জ্যোতিষ বিষয়ে আলোচনা এবং আমার সঙ্গে পরিচয় করার তাগিদে থানায় ডেকে পাঠিয়েছে। "

মধুসূদনের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। হেসে বললাম, " জ্যোতিষীদের একি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। যে জ্যোতিষী তাঁর গ্রাহকের যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে গ্রহ-রত্ন, পাথর, তাবিজ, কবজ, মাদুলি ইত্যাদি দিয়ে থাকে। আর যখন যুক্তিবাদী সমিতি'র সংকট ঘাড়ে চেপে ধরে তখন আবার এই জ্যোতিষীরাই গ্রহ-রত্ন,পাথর, তাবিজ, কবজ ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে পুলিশের সাহায্য চায়! যুক্তিবাদী সমিতি'কে আটকাতে শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাহায্য! হায় রে প্রতারক জ্যোতিষীরা। এই জনই আমার যুক্তিবাদীরা বুক ঠুকে বলে থাকি, " যে যত বড় জ্যোতিষী সে ততো বড় প্রতারক। "

মধুসূদন বললেন, “জ্যোতিষীরা কেউ-ই জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিল-মাত্র বিশ্বাস করে না। জ্যোতিষীরা তাঁদের জীবনের কোন সমস্যার সমাধানের জন্য গ্রহ-রত্ন ধারণ করে না। অসুখ হলে ডাক্তার দেখায়। মামলা হলে উকিল রাখেন। এমনকি ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে খদ্দের ধরতে পত্র- পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু লোক ঠকানোর জন্য বুজরুকি রূপ ধারণ করে থাকা এই জ্যোতিষীরা হাতের আঙ্গুলগুলিতে, গলায় গ্রহ-রত্ন, তাবিচ, কবচ ইত্যাদি ধারণ করে থাকেন। কিন্তু এইসব হিজিবিজি জিনিসে এই জ্যোতিষীদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। ”

আমি বললাম, “জ্যোতিষ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করার জন্য যখন থানার ওসি ডেকে পাঠিয়েছেন, তোমরা অবশই যাও। এটা আমাদের কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগ। পুলিকেও এটা বোঝানো যাবে, যে জ্যোতিষ পেশার কোনও আইনি স্বীকৃতি নেই। এই বেআইনি পেশায় বৃত্তিকর নেওয়া হয় না। বেআইনি পেশার সঙ্গে জড়িত জ্যোতিষীদের বা তাঁদের সংগঠনের সম্মেলনও এক কথায় বেআইনি। পুলিশের সঙ্গে দেখা করার পর আমাকে সবকিছু জানাবে। ”

এদিকে আমার দুষ্টুবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ১৩ জানুয়ারী ‘পুরুলিয়া দর্পণ’-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি একটি জ্যোতিষ সংগঠনের ডাকে আজ পুরুলিয়ার নিস্তারিনী মহিলা কলেজে জ্যোতিষ সম্মেলন হতে চলেছে। তাই একটু খুঁচিয়ে দেখার জন্য ওই বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত মোবাইল নম্বরে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে সংগঠনের সভাপতি অভিজ্ঞান আচার্যকে ফোন করলাম। আমি প্রশ্ন করলাম, “ ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’র তরফ থেকে আপনাদের বেআইনি সম্মেলন বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। সমিতি’র জেলা সম্পাদক মধুসূদন মাহাত-র দাবি, ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস (অবজেকসনেবল এডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪ আইন অনুযায়ী জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা ও প্রচার করা বে-আইনি। এরপরেও জ্যোতিষ সম্মেলন কি করে আয়োজিত হচ্ছে ? ”

আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই আচার্যজী রেগে অগ্নিশর্মা। “ জ্যোতিষ বেআইনি নয়। যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমাদের সম্মেলন বন্ধ করে দেখাক ওঁরা ? ” এই বলে উনি ফোন কেটে দিলেন।

প্রায় দু’ঘণ্টা পরে মধুসূদন আবার আমাকে ফোন করে বললেন, “ আমি ও জয়ন্তদা থানায় গিয়েছিলাম। ওসি জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনা করেন। ওসি কোনও সময় জ্যোতিষের পক্ষে, কোনও সময় বিপক্ষে কথা বলেন। এরপর তিনি আমাদের কাছে জানতে চান ওই জ্যোতিষ সম্মলনে আমাদের যুক্তিবাদী সমিতি’র কোনও বিক্ষোভ কর্মসূচি রয়েছে কি না ? আমরা জানাই, আমাদের কোন বিক্ষোভ কর্মসূচি নেই, ব্যাপারটা আমরা প্রশাসনের মধ্য দিয়েই করতে চাই। এরপরেই দেখলাম ওসি জ্যোতিষ সম্মেলনের আয়োজকদের ফোন করে আশ্বস্ত করলেন, তাঁদের ভয়ের কিছু নেই, যুক্তিবাদীরা হাঙ্গামা করবে না। এর ফলে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল জ্যোতিষীরা যুক্তিবাদী সমিতি’কে ভয় করেছিল। তাই ভাগ্য, কুষ্ঠি, গ্রহ-রত্ন,আংটি, মাদুলির ইত্যাদির উপর বিশ্বাস হারিয়ে, শেষ পর্যন্ত পুলিশের উপর ভরসা রেখেছিল। জেলাশাসক ওসিকে তদন্ত করতে বলেছেন, এই দাবিটা ওসি আসলে মিথ্যা বলেছিলেন। আসল সত্যিটা হল, জ্যোতিষীরা সম্ভবত টাকার বিনিময়ে ওসিকে বশে এনেছিলেন নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই।”

আমি বললাম, “ ভাবতে অবাক লাগছে, বেআইনি পেশার সঙ্গে জড়িত জ্যোতিষীদের সরকারি সভাগারে সম্মেলন বন্ধ করার পরিবর্তে পুলিশ যুক্তিবাদীদের থানায় ডেকে পাঠাচ্ছে। একই সঙ্গে শুধু মাত্র টাকার বিনিময়ে এক প্রিন্সিপাল জ্যোতিষকে আইনি বলে দাবি করেছে। এঁরা কোন শিক্ষায় শিক্ষিত, তার জবাব সময় দেবে। কিন্তু

জ্যোতিষীদের বেআইনি সম্মেলন বন্ধ করার জন্য আমরা যুক্তিবাদীরা যে বিশাল কাজ করেছি, তা নতুন প্রজন্মের কাছে একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে।”

সন্তোষ শর্মা
সংযুক্ত সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
ব্যারাকপুর, কলকাতা - ১২২
মোবাইল : ৯৩৩০৪৫১৯৭৭

গীতা-উপনিষদের বাক্য আমরা নির্বিবাদে ও নির্বিচারে মেনে নিই, কেননা ওসব প্রাচীন বলেই সত্য এবং সম্ভবত সত্য বলেই প্রাচীন। কিন্তু এও তো মিথ্যে নয় যে, আর সব-কিছুর মতো সত্যেরও জন্ম, যৌবন ও বার্ধক্যের কাল আসে — সেও যথানিয়মে নবীন সত্যকে স্থান ছেড়ে দিয়ে শেষে প্রাচীন পুঁথির মিউজিয়ামে — সনাতন কবরখানায় — দেহরক্ষা করে। সত্যসত্যই যদি কোনো কালে মানুষ ভগবানরূপে দলে-দলে বিচরণ করে থাকে, এখন আর তাদের সশরীরে দেখতে পাওয়া যায় না; — কাজেই কথিত সত্য এখন আর জীবন্ত হয়ে নেই, পুঁথির পাতায় নির্বিকল্প আশ্রয় গ্রহণ করেচে। সুতরাং দুঃখ যতই সুক্ষ হোক, যা নেই — তা নিয়ে, যা আছে তার সঙ্গে লড়াই করাটা অসাধারণ আস্তিক্য-বুদ্ধির পরিচয় হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের রেষারেষির লড়াইটা প্রায়ই শেষাশেষি গিয়ে খুব সুবিধার দাঁড়ায় না।

— শিবরাম চক্রবর্তী (মস্কো বনাম পন্ডিচেরী)



আলেয়ার ভূত

- ফারুক আলী

উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার, নদিয়া-মুর্শিদাবাদের, বর্ধমানের অনেক বন্ধুরা তাদের বাবা কাকাদের মুখে শুনেছেন কিংবা প্রতক্ষ্যদর্শী যে, পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে আড্ডা মারতে গিয়ে পুকুরে অদ্ভুত আলো কিংবা বড়গাছে আলো দেখেছে, যেটা নাকি প্রদীপের মতো আলো অটোমেটিক জ্বলছে বা দপদপ করছে, কিন্তু আসে পাশে কেউই নেই! অনেকে এইসব দেখে জ্ঞানও হারিয়েছেন নাকি বা মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছেন শুনি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে এটাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যেমন -আলেয়া, ভূতের আলো, জলার পেত্নী বা পরী ইত্যাদি। যারা সাহসী তারা একটু এগিয়ে গেলেন আলোটাকে ধরতে। কিন্তু দূর্ভাগ্য, কাছে যেতেই আপনার উপস্থিতি টের পেয়ে আলোটা নিভে গেলো।

আসুন জেনে নেওয়া যাক এটা আসলে কি- ইংরেজিতে এই আলোটাকে বলে ‘Will-o’-the-wisps’.। ১৭৭৬ সালে আলেজান্দ্রো ভোল্টা সর্বপ্রথম মিথেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথম সন্দেহ করেছিলেন আলেয়ার মতো প্রাকৃতিক আলোর মত ভূতূড়ে ঘটনার পেছনে মিথেন গ্যাসের অবদান আছে। তাঁর সেই তত্ত্বই পরে আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা দিয়ে আরো নিখুঁত ও পরিশোধিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা - পৃথিবীর সব গাছপালা, পশু-পাখি, মানুষ মূলত জটিল হাইড্রোকার্বন জৈবযৌগের সমন্বয়ে গঠিত। এইসব জৈবযৌগের মূল উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। এইসব জৈবযৌগ যখন উন্মুক্ত পরিবেশে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পচতে থাকে তখন বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হয় জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং কিছু পরিমাণ তাপ। কিন্তু যখন এইসব জৈবযৌগ পচার সময় উন্মুক্ত পরিবেশের অক্সিজেন পায় না তখন কি হতে পারে? ধরুন এরা খোলা বাতাসে পচার বদলে কোন পুকুর বা ডোবার পানির নিচে পচছে- সেই ক্ষেত্রে কি হবে? তখন বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি হবে মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, ফসফিন ইত্যাদি।

এই মিথেন এবং ফসফিন গ্যাস যখন পানি ছেড়ে বুদবুদের মাধ্যমে ভেসে উঠবে এবং খোলা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসবে তখন মিথেন গ্যাস ফসফিনের সাথে বিক্রিয়া করে নীল আলো উৎপন্ন করবে যেটাকে দেখা যাবে আশেপাশের বাতাসে ভেসে বেড়াতে। ফসফিন হচ্ছে দাহ্য গ্যাস যেটা বাতাসের সংস্পর্শে এলে স্বতস্ফূর্তভাবে জ্বলে উঠে। যখন ফসফিন বাতাসে জ্বলতে থাকে তখন এটা আবার সাদা ধোঁয়ারও সৃষ্টি করে। ফলে সেই নীল আলোর চারপাশে একটা ধোঁয়ার মত অবয়ব চোখে পড়াও বিচিত্র কিছু নয়। যখন কেউ সেটাকে ধরতে যাবে তখন তার উপস্থিতিতে মিথেন এবং ফসফিন গ্যাসের মিশ্রণটা চারপাশে ছড়িয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। ফলে আলোটাও হারিয়ে যাবে। সুতরাং আলো ধরতে না পারার জন্যে দুঃখ করার বা ভয় পেয়ে জ্ঞান হারানোর কোনো কারণ নেই!

প্রত্যেকটা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেই এইসব আলেয়ার আলো নিয়ে অনেক বিচিত্র কিংবদন্তী ও গল্প,কুসংস্কার প্রচলিত আছে। সবকটাতেই এই আলোর বিশাল অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারগুলো বেশ চটকদারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আলজান্দ্রো ভোল্টার মত রস-কষহীন বিজ্ঞানীরা যথারীতি পুরো ব্যাপারটার অলৌকিক মাহাত্ম্যকে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলেছেন।

ছবি - ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফি ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া।

করোনা অতিমারীতে ঈশ্বর কোথায়?

-রামকৃষ্ণ মন্ডল

ভক্তদের বিশ্বাসে ঈশ্বর রয়েছে। বিশ্বাস মানে, ধরে নেওয়া সত্য। বিশ্বাস কোনও প্রমান নয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকতেও পারে, আবার না থাকতেও পারে। যদি কিছুক্ষণের জন্য ধরে নেওয়া হয় যে--- ' ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে ', তাহলে এখন এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ঈশ্বর কোথায়!! ভক্তদের ডাকে তিনি কেন সাড়া দিচ্ছেন না! ভক্তদের দিক থেকে একটা কথা উঠে আসতে পারে যে- মানুষ নিজের অপকর্মের কুফল ভোগ করছেন, এক্ষেত্রে ঈশ্বর কি করবেন। ভালো কথা, কিন্তু ঈশ্বর নাকি ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক, তাহলে তিনি এই সব অপকর্ম রোধ করলেন না কেন ? তাহলে কি আমরা এটা ধরে নিতে বাধ্য হবো, ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে কিছুই নেই, নাকি ইচ্ছে করে কুকর্ম রোধে সক্রিয় হননি। যদি সেটাই হয়, কুকর্ম রোধে ইচ্ছে করেই তিনি মাথা ঘামায়নি তাহলে আরেকটা জোরালো প্রশ্ন সামনে চলে আসে। প্রশ্নটা হলো কুকর্ম রোধেও যদি ঈশ্বরের ভূমিকা না থাকে, তাহলো কোন আদর্শের জন্য আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করবো!!!

[ঈশ্বর সম্পর্কে শত শত প্রশ্ন-উত্তর রয়েছে, তবে এই লেখাটি করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।]

ঈশ্বরে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। শুধু তাই নয়, এ নামটাকেই আমি ঘৃণা করি। এইসব গল্প দিয়ে আর কতদিন সমাজ-সংসার চালাতে হবে, সেটা আমাকে বুঝতে হবে। এ-সব বানানো গপ্পো সম্পূর্ণ জোচ্চুরি। আর বেবাক জোচ্চুরি দিয়ে খুব বেশিদিন ঠকানো বা ঠকিয়ে রাখা যায় না, এটাও ভাববার সময় এসেছে।

— ঋত্বিক ঘটক (চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু)



কবিতা:

কফি কাপটা

-সুক্রোমণি

হ্রদে ভেসে থাকা জেলেরা আনন্দে খুশি
যেখানে ইচ্ছে ডুব দেয়,
উন্মত্ত হাওয়ায় তোমার চুলগুলো উড়তে থাকে
প্রত্যেকে কাউকে খুঁজে বেড়ায়
কিন্তু এখানে আমি একা
বেঞ্চে বসে জীবনের কথা ভাবছি
কেন কঠিন হয়ে কেটে যাচ্ছে আর দ্রুত
দেখতে দেখতে কফি কাপটা ঠান্ডা হয়ে গেলো।

নাচার

-প্রদীপ চক্রবর্তী

থালা - ঘটি - বাটি বাজাও
কিছু লাভ হবে না,
বিজ্ঞানের সাহায্যে
দূরে রাখ করোনা।

মূত্র পানে স্বাস্থ্য হানি
আমরা নাচার,
যুক্তির তেজেতে
বধ কুসংস্কার।

গ্রহ-তারা আকাশেতে
দেখেছি সবাই,
ভাগ্যের সাথে তার
যোগাযোগ নাই।

কর্মের হাত ধরে
আসে যে সুফল,
যুক্তিবাদী হলে পরে
হবেই সফল।

শুভ বুদ্ধির উদয় হোক

-জামাল আনসারী

ধর্মের উনুনে নিজেদের রুটি সেঁকে রাজনৈতিক দলের নেতা,
ইতিহাস একমাত্র নীরব সাক্ষী, গুজরাট, দিল্লির হিংসা দেখা।
ধর্ম খাই না মাথায় মাখে? জানে না দেশের প্রান্তিক লোকজন,
তবুও হিংসার লেলিহান শিখায়,পুড়ে তাদেরই আত্মীয় স্বজন।

ঝোপ বুঝে কোপ মারে শয়তান নেতা, বর্ণ চোরা আমের মতো
অরন্যের দাবালন সম হিংসার বহি শিখা বাড়তে থাকে তত।
ধর্ম এক আফিম! মুহূর্তে গলাগলি পরিণত হয় গোলাগুলি তে,
মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী বিশ্বমাঝে! বিস্মৃত হয় এই কান্ড জ্ঞান দেখে।

মানুষকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার চেয়ে মহান আর কিছু কর্ম নাই
দেখো মানুষের বুকের রক্ত নিগড়ে, রাজনৈতিক নেতারা খাই।
ধর্ম আর পঙ্কিলময় সর্বনাশা রাজনীতির কূটচালে পড়ে মানুষ,
আজ বন্ধক রেখেছে তাদের নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধি মান- হুশ।

ধর্ম কি মানুষকে খেতে দেয়?পরতে দেয়?তবুও মোদের গর্ব কত?
ধর্মের ঠিকাদার খুলছে ব্যবসাকেন্দ্র দেখো--ব্যাঙের ছাতার মতো।
মানুষের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, ভারতে জ্ঞানের আলো আসুক।
ধর্মের বেড়াজাল ছিন্ন করে, মানুষ শুধু মানুষ পরিচয়ে বাঁচুক।

ভারতবর্ষ আজও

-সঞ্চারী মজুমদার

আমার নীল হয়ে যাওয়া মৃতদেহের পাশে
বাঁচার উষ্ণতায় মাথা তুলেছে সবুজ দুটি পাতা।
চারিদিকের কলহ সত্বেও আমায় নিয়ে,
সবাই চুপ, রয়েছে শুধুই উদাস নীরবতা।
ভোটের যুদ্ধে শিতলকুচির মাটি, ভিজে উঠেছে
স্বজনহারাদের কান্নায়।
তাইতো এবার আওয়াজ ওঠাও
"বন্ধ শোষণ! আর নয়!!"
উপবাসী শিশুর চোখের জলে আজও
কোনো প্রতিশ্রুতি বাঁধ দিতে পারেনি ;
আজও বিচার পায়নি কত
ধর্ষিতা দলিত তরুণী।
ঘরে ঘরে উঠুক জ্বলে
প্রতিবাদের আগুন আজ!
জনজাতি, গায়ে ওঠাও
যুদ্ধে যাওয়ার রণসাজ।।

রক্ত গোলাপ

-শুভায়ূ রুডান

তোমার অমানবিক শূন্য হৃদয়ে গোলাপ হয়ে ফোঁটার কথা ছিলো,
আমি সেই গোলাপ নিয়ে প্রত্যেকটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেওয়াল লিখন হয়ে উঠবো, কথা ছিলো।
তুমি শ্লোগান হবে, আমি চিৎকার
তুমি হাত রাখবে, আমি ব্যারিকেড
আমরা প্রতিবাদের তীব্রতা মেপে দেখবো শাসকের থার্মোমিটারে, কথা ছিলো।
একদিন ক্ষমতা, তার অহংকার ত্যাগ করতে বাধ্য হবে, হবেই
এই বিশ্বাসে ভর করেই এগোচ্ছিলাম আমরা, হার না মানা দূর্বার গতিতে।
কিন্তু একদিন পাল্টে গেলাম আমরা
আমরা ক্ষমতা হলাম
আমরাও অহংকারী হলাম
আমরা শাসক হয়ে উঠলাম
আমরাও শোষণ করলাম
আমরা বিক্রি হলাম, লোভের কাছে
আরো চাই এর নেশায় আলাদাও হলাম একদিন
আমাদের সৃষ্টিশীলতা আমাদের ত্যাগ করলো
ফলে মৃত হলাম, বোঝার আগেই।
কিন্তু জেনে রেখো প্রিয়তমা কেউ আবার গোলাপ হবে, দেওয়ালে লিখবে প্রতিরোধ
কেউ আবার রক্ত গোলাপ হবে, নেবে সব অন্যায়ের প্রতিশোধ।
ক্ষমতা একদিন ঠিক ক্ষমতাহীন হবে, হবেই।
ক্ষমতা একদিন রাস্তার সস্তা ধুলোবালি হবে, হবেই।।

অনুগল্প:

দুঃখিনী

-জামাল আনসারী

আজন্ম দুঃখিনী সীতাদেবী তার একমাত্র গর্ভজাত পুত্র সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছে। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই তো আর সকলেই শিক্ষিত হয়না! কেউ কেউ শিক্ষিত না হয়ে গর্দভও হয়। বিশ্বভুবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও বোধহয় সিতাদেবীর একমাত্র ছেলে চিরঞ্জিতের মতো দ্বিতীয় গর্দভ এর সন্ধান পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ?

ভালোবাসা মানুষকে যেমন আপন করে নেয়, তেমনি কখনও কখনও ভালোবাসা কাউকে কাউকে অন্ধ করেও দেয়। চিরঞ্জিত গ্রামেই এক সহপাঠীকে ভালোবেসে একদিন হঠাৎ বুড়ো মাকে একলা বাড়িতে ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।সেই দিন থেকে দীর্ঘ কুড়িটি বসন্ত সীতাদেবীর একমাত্র ছেলের পদশব্দটুকু একটিবারের মতো কান পেতে শোনায় জন্য অধীর আগ্রহে,প্রতিটি মুহূর্ত কাটে। অপেক্ষায় তীর্থের কাকের মতো মাটির কুঁড়ে ঘরে পথ চেয়ে বসে থাকে। কিন্তু বসে বসে থাকলে তো আর দিন চলে না। যা কিছু বিষয় আশয় ছিল বিক্রি করে কোনও কর্মে দিনপাত চলে। তাছাড়া এতদিন ধরে গ্রামের পাড়া প্রতিবেশীরা দয়া বশত যথা সাধ্য সাহায্য সহযোগিতা করেছে।এই পরনির্ভরশীল জীবন সীতাদেবীর আর ভালো লাগে না।তাই একদিন সে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়, আর গ্রামে থাকবে না। কিন্তু যাবে কোথায়? শরীরে আর তো সেই আগের মতো তেজ নেই। সে ভাবে,গ্রাম ছেড়ে বহুদূরে ভিক্ষা করে খাবে! তবুও গ্রামে আর থাকবে না।

একদিন রাত্রে হঠাৎ পাড়া প্রতিবেশীকে না জানিয়েই পরনের শতছিন্ন শাড়িটি পরেই সত্তর বছরের রুগ্ন জীর্ণ শরীরটাকে নিয়ে চুপিচুপি জন্মের মতো গৃহের মায়া ত্যাগ করে|গভীর রাত্রে খালি পায়ে হেঁটে এসে এক ষ্টেশনে একটি পেসেঞ্জার ট্রেনে ওঠে।সকালে ঘুম ভাঙ্গলে দেখে এক বিরাট ঝাঁ চকচকে রেল স্টেশনে সে পড়ে আছে। জীবনে কোনোদিন এতবড় ষ্টেশন দেখার সৌভাগ্য সীতাদেবীর হয় নাই। কিন্তু ষ্টেশনটি যতই আধুনিক ঝাঁ চকচকে হোক না কেন, তাতে কি আর দুঃখিনির পেট ভরবে? অগত্যা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পাশের দোকানগুলোতে ভিক্ষাবৃত্তি করতে লাগে।

একদিন একটি কাপড়ের দোকানে নতুন নতুন জামা কাপড় পরা পুতুলগুলিকে দেখে অবাক হয়ে ভাবে, যার প্রয়োজন তার দেহের লজ্জা নিবারনের কাপড়টুকু নাই,আর এই পুতুল গুলি? মুহূর্তে নজর পড়ে,দোকানে বিশাল আকারের ফ্লেক্সে বড়বড় অক্ষরে পরিস্কার বাংলায় লেখা" চিরঞ্জিত শাড়ি স্টোর।'' সিতাদেবী তার মলিন কাপড়ের আঁচলে অশ্রু মুছে, অস্ফুট স্বরে বলে,"আমার ছেলের নাম চিরঞ্জিত!"

ব্যবসা হবিবুল্লাহ

-মহম্মদ মহসীন

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ গল্পের শিরোনামের মানে কি?
তাকে অকপটে জানাই, আমি জানি না।
তাহলে এ লেখার এমন নাম দিলাম কেন?
এর একটা ইতিহাস আছে।
ইতিহাসটি হলো আমার পাশের গ্রামেই থাকে এক যুবক। বেকার। হ্যাঁ, এটাই ওর কাছে ওর বড় পরিচয়। কিন্তু আমাদের কাছে ও একজন যুক্তিবাদী। নানান ক্রাইসিসে মানুষের মাঝে যুক্তিবাদের প্রসারে আত্মনিবেদনকৃত। সাপের কামড়ে ওঝার কাছে না গিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সচেতনতায়। জ্যোতিষীকে চ্যালেঞ্জে। জণ্ডিস তোলা, ডাইনির কু নজর, জ্বীন ভূতের দাবীদারকে পাবলিকলি এক্সপোজ করার সাহসিকতায়। ভণ্ড গুরু পীরবাবাদের ভণ্ডামি উন্মোচনে। সব সময় সাথে পাবে ওকে।
কিন্তু বড় দুঃখের কথা। তাকে আজ দেখলাম এক ভিন্ন রূপে। সম্পূর্ণ বদলে গেছে সে। অর্থের নেশায় উন্মত্ত।

সে এখন এক জ্যোতিষী। ঠিক জ্যোতিষী নয়, জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়া, "বিজ্ঞানভিত্তিক" পথপ্রদর্শক,   আসলে স্টোন বিক্রেতা। ডায়ামণ্ড, রুবি,এমর‍্যাল্ড,সাফ্যায়ার, ব্লু, পিঙ্ক, ইয়োলো। একই কাটিংয়ের কত নাম। সব ব্যবসা। মাছের মত সাইজ বাড়লে রেট বাড়ে, এরও তেমন, সাইজ আর খদ্দেরের সামাজিক স্তর সমানুপাতে দাম। খদ্দের যত শাঁসালো, ফাঁড়া তত বেশি, বিজ্ঞানের কপচানির সাথে লাভের অঙ্কের উচ্চলম্ফন। নিশ্চিত এক আয়ের পথ।
আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।
বাম নেতার রামের দলের পতাকা নিয়ে তাদের মিছিলে জয়শ্রীরাম স্লোগান দিতে দেখেও এত অবাক হই নি।
আমাকে দেখে ও লজ্জা পেল না, ভয় পেল না, সংকুচিত হলো না, পালিয়ে গেল না।
কাজেই তার কাছে গেলাম। কথা বলবো। কিন্তু আমার আগে ও-ই প্রথম শুরু করলে, আগুন ঝরা লেখাগুলো এখনো লিখে যেতেও পারি। কিন্তু যুক্তিবাদী আন্দোলনে জ্যোতিষ নিয়ে যা পড়াশুনা, অভিজ্ঞতা আছে, অন্ধবিশ্বাসীগুলোকে মুরগী করে স্টোন বিক্রি করে যাবো। এটাই আমার ব্যবসার রেসিপি। ধর্মান্ধ, আকাঠ, গবেট, বি. এ, এম.এ, ডক্টরেট, ডিগ্রীওয়ালা শাঁসালো মাস্টার, প্রফেসার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ক্লায়েন্টের বাড়ি গিয়ে জ্যোতিষের আফিং-এ আরো ডোজ বাড়িয়ে দু হাজারের স্টোন বিশ হাজারে বেচবো।
কারণ ব্যবসা হাবিবুল্লাহ।
এবার আমি সত্যি সত্যি কী বলবো বুঝে উঠতে পারলাম না।
সে-ই আমাকে বোঝালে, আসলে হয়েছে কী, আমার যে শেঠ, তিনি বম্বের এক বড় জহুরি। আবার তিনি এক বড় মৌলানা, ওয়াজি হুজুরও বটে। তার বেশ শাঁসালো মুরিদানও (শিষ্যও) আছে। সেখানে ঢঙ একটু আলাদা। জমজমের জলে শোধিত আসল জেমসের আল্লাহ লকেট, আলী লকেটা, আয়েষা সুরমা। অনেকটা ঠিক হনুমান

যন্ত্র বা দেবতার বিভূতি। মুরিদানের বাড়ি ওয়াজও করেন, ব্যবসায়ের জমিও চাড করেন। জাকির নায়েক ঢঙে। মুখস্থ টুখস্থ ভালোই করেছে। আমি নিজেও কোরাণের আয়াত টায়াত, সুরা টুরা মুখস্থ করে একটা পার্ফর্ম্যান্স দেখিয়েছি। একটা সিজনেই পঁচিশ হাজার থেকে লাখ খানেক, কখনও বা লাখ দুয়েক আয়। হুজুরের কমিশন 20% থেকে লাভ অনুযায়ী 30%। বাকিটা আমার। বড় কথা হল আমার বসই ওয়াজে কায়দা করে বাজারি স্টোন, জ্যোতিষের বিরুদ্ধে কোরাণের কত আয়েত ঝাড়লো। অথচ সে আর মারাঠী ব্রাহ্মণ, এক ধর্মগুরু, মণিলাল, জহুরি বাজারে স্টোন মার্চেন্ট দুনিয়ায় রাজ করে। ডাইরেক্ট শ্রীলঙ্কা বা মাদাগাস্কারের মাইন থেকে জেমস এনে এখানে কাটিং করে। এর এক টুকরোও বাদ যায় না। সবচেয়ে ধনীর ঘরে যায় সবচেয়ে বড়টা, গরীব গুর্বো, ছাপোষার ঘরে যায় নিচে পড়ে যাওয়া কুড়ানো চুনীগুলো। ঠিক যেমন বড় ইলিশ খায় বড় লোকে, চুনোপুঁটি খায় ছাপোষায়। কিন্তু আমার বস আর মণিলাল জুটি গুরুগিরিও করে, ব্যবসাও করে।

তাকে কেউ এ বিষয়টা তুললেই পরিষ্কার বলে দেয়- " ব্যবসা হাবিবুল্লাহ।" আমি জানি না, এর মানে কী।

বড় লোকের বিটি! গান শিখেছে, টিভিতে দুবার গান টান গেয়ে দুটো হাততালি পেয়েছিল, আর তাকে কেউ কেন ডাকে না! দেখাও হাত, নাও একটা স্টোন। বাপের বহুদিনের কারবার, ইদানিং আউটপুট তেমন দেখতে পাচ্ছে না, বিশ্বস্ত লোকের রেফারেন্স পেলে সেখানেও দশ আঙুলে দশটা স্টোন সাজানোর প্রজেক্ট অবশ্যই নেওয়া যায়।

ব্যর্থ প্রেমের কেস গুলো একটু সিমপ্যাথি থেরাপির সাথে স্টোন দিলে তো দরদামই করতে হয় না। জ্যোতিষ দুনিয়ায় এমনই হাজার এপিসোড। আর গরীব গুর্বো মধ্যবিত্তের দৌড় ঐ চল্লিশ পঞ্চাশ তক। তবে তাদের বাড়ি ঝাড় ফুঁক দোয়া তাবিজ করে পাঁচ দশ হাজার হাতানো একেবারেই রুটিন জব।

মাসে পঞ্চাশ ষাট মার্জিন তো আছেই। একা পারি না, বিভিন্ন শহরে সেলার বসিয়েছি। কোনো কোনো বৎসরে কোম্পানির টার্ন কোটি ছাপিয়ে যায়।

কুসংস্কারের চাষে জল সার দিয়েই আমার আয়।

আমার পেশার ক্লায়েন্ট ঐসব অন্ধ গবেটগুলো। ওরাই আমার রিসোর্স। আজ আমার বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের ওরাই যোগানদার।

এবার

আমি একটা গল্প শোনালাম, আমার এই হঠাৎ ধনী বন্ধুটিকে।

আবদুল্লা আল মাসুদ। ঢাকায় একটি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন এই মুফতি। কিন্তু সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। জেনেছেন কোরাণ মিথ্যা। মিথ্যার ভিতের উপর ধর্মের বিশাল ইমারত। জানালেন সে মিথ্যা। কিন্তু ধর্ম চিরকালই ভয় পায় আলোকে, সত্যকে। বরং বলা যায় সত্যের আলোয় তাদের অন্ধকার সাম্রাজ্য তছনছ হওয়ার ভয় সদা সর্বদা। তাই মস্তিষ্কবিহীন পাহারাদার সদা সর্বদা নিয়োজিত। সত্য যে বলতে চাইবে, ঘাড় থেকে তার মাথাটি কেটে নেওয়ার বিধান কার্যকর করার হাজার জেহাদি, হাজার মূর্খ, হাজার নীরবে-অন্যায়- সহ্য- করে- যাওয়া-জনগণ। এরা অভিজিৎকে মারে, বাবু ওয়াশিকুরকে মারে, অনন্ত বিজয়কে মারে, আরেফিন দীপনকে মারে, গৌরী লঙ্কেশকে মারে। হত্যা করে সাজাহান বাচ্চুকে, জাফর ইকবাল স্যারকে। হামলা করে আসিফ মহিউদ্দিনকে। হামলা করে রাফিদা আহমেদকে। হত্যা করে গোবিন্দ পানসারে, নরেন্দ্র দাভোলকার, এম এস

কুলবার্গি, পাকিস্তানের খুররম আর কত নাম বলবো। সব তো জানিও না। নীলয় নীল কিংবা সাজাহান বাচ্চুকে তো দিনের আলোয় মারে। আসিফ মহিউদ্দিনকে দেশ ছাড়া করে। দেশছাড়া করে তসলিমাকে।

কাজেই সাজানো সংসার, সুখের সাম্রাজ্য ছেড়ে, মাতৃভুমি ছেড়ে পাড়ি দিতে হল মাসুদ ভাইকে অনিশ্চিত জীবনে পাশের দেশে। এলেন কলকাতায়। কী অসহনীয় একাকী নিরাপত্তাহীন জীবন।

তবু তিনি বলে চলেন, " অদ্ভুত অন্ধকার চারিদিক। সেখানে এক ঝাঁক সাহসী তরুণ আলোর মশাল নিয়ে এগিয়ে চলেছে জোরকদমে। আমি তাদেরই একজন।"

এখানে সত্যকে পাথেয় করলে ধর্মান্ধরা খুনের চেষ্টায় থাকে।

তবুও তিনি অকপটে ঘোষণা করেন নিজের পরিচয়, আমি মানি না আল্লাহর অস্তিত্ব। জানালেন মিথ্যা কোরাণ, মুহাম্মদের মিথ্যাচার। আমি এক্স- মুসলিম। আমি ইসলামকে ত্যাগ করেছি, আমি মুরতাদ।

আর মুরতাদের জীবনকে দুর্বিষহ করার জন্য উঠেপড়ে লাগে সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধরা।

তবু তিনি তার পথে অবিচল। শিরদাঁড়া এতটুকু নোয়াবার নাম নেই। এত অসহায়তার মাঝেও তিনি আওড়াতে পারেন ম্যাক্সিম গোর্কির বাণী, " ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকবে আক্রোশের আগুন, আর তার তেজে বাঁকা এ মেরুদণ্ড সোজা হয়ে ওঠে"।

তার একটি গল্প শোনাই। মিজানুর আজহারি নামের তার এক সহপাঠী ছিল। সে এখন জাকির নায়েকের শিষ্য। থাকে মালয়েশিয়ায়। কোটি কোটি টাকার মালিক।

মাসুদ ভাই যদি চাইতেন, এই একাকীত্বের নিরাপত্তাহীন অসহায়ত্বের জীবন না কাটিয়ে এই রকম কোটি কোটি টাকার মালিক হতেন, কারণ আজহারির থেকে ইসলামিক জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে মাসুদ ভাই অনেক উপরে। কিন্তু তিনি সুখের জীবন ত্যাগ করে বেছে নিয়েছেন সত্যের পথ, যে পথে প্রতি মুহুর্তে আছে

মৃত্যুকে আলিঙ্গন।। সত্য যে কঠিন। কঠিনেরে ভালবাসাই জীবন, মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে। তাহলে আর ভয় কিসের?

এ গল্পের শেষটায় কিন্তু আমি নিজে আরও আশ্চর্য্যান্বিত।

বন্ধুটির সাথে বহুদিন যোগাযোগ রাখতাম না। ও তখন থেকে পাকাপাকি বম্বের বাসিন্দা। হঠাৎ এই কদিন আগে, মানে গত বৎসর লকডাউনের আগে একবার বাড়ি এসেছিল। আমার সাথে দেখা করতে এলো। এটা সেটা কথার পর জানালো, জানো ওসব বুজরুকির কারবার ছেড়ে দিলাম। আগে আমার যুক্তি ছিল, আমি স্টোন সাপ্লাই না করলেও অন্য কেউ তো করবেই, কারণ এর বাজার আছে, অন্ধবিশ্বাসী খরিদ্দার আছে।

এখন ভাবলাম, যে করে করুক, আমি জ্যোতিষীদের আর স্টোন সাপ্লাই করবো না। অন্তত এ ব্যবসায়ের একটা সাপ্লায়ার তো কমলো! আর উদ্যোগ থাকলে অনেক কিছুই করা যায়। কলকাতায় স্টোন-জুয়েলারি স্বর্ণ কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখেছ? ওটার আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টার। হাওড়া সন্ধ্যাবাজার, বড়বাজারে কলাকার স্ট্রীট, জোড়াসাঁকোয়, ক্যামাক স্ট্রীটে আর কাকুড়গাছিতে শোরুম দিয়েছি। ডোমজুড়ে একটা কারখানাও করেছি।

আজ আমায় পাবে একাডেমির সামনে গজিয়ে ওঠা দরগা ভাঙার আন্দোলনে, মুক্তমনা হত্যায় রাষ্ট্রের সমর্থনের বিরুদ্ধে রাজপথ অবরোধে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতায়।

ও তো বকবক করছিল। আমি দেখলাম একটা ছেলে ঠিক আলোর বৃত্তে ফিরে এসেছে।
আমি বললাম, কিন্তু ঐ যে বলছিলে, মনসুর হবিবুল্লা না কী যেন?
হো হো করে অট্টহাস্য দিয়ে বললে, মনসুর হবিবুল্লাহ নয়, ব্যবসা হবিবুল্লাহ। কিন্তু প্লিজ, এখনও মানে জিজ্ঞেস কোরোনা।

যে মানুষ প্রগতির পক্ষে, পুরানো বিশ্বাসের প্রত্যেকটি উপাদানকে তাকে সমালোচনা করতে হবে, সন্দেহের চোখে দেখতে হবে ও প্রয়োজনে অবিশ্বাসও করতে হবে। প্রচলিত বিশ্বাসের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়কেই চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে লাগবে। অনেক তর্কাতর্কি ও আলাপ-আলোচনার পর যদি কেউ কোন মতবাদ বা দর্শনে আস্থা রাখে তবে তাকে স্বাগত জানানো যেতে পারে। যদি তার বিচারের ধারা সঠিক পথ নাও খুঁজে পায় বা ভুল পথে এগোয় তবুও তাকে সংশোধন করে সঠিক পথে নিয়ে আসা সম্ভব, কারণ যুক্তিই হল তার জীবনের ধ্রুবতারা। কিন্তু সবথেকে ক্ষতিকারক পথ হল অন্ধবিশ্বাস। কারণ, সে জিনিষ মাথার বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দিয়ে মানুষকে ভুল পথে ঠেলে দেয়। যিনি নিজেকে বস্তুবাদী বলে দাবি করেন তাঁকে সমস্ত সনাতন ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, যুক্তিতর্কের শাণিত আক্রমণের মুখে যদি দাঁড়াতে না পারে তবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।
— ভগৎ সিং (কেন আমি নাস্তিক)



চেতনা পত্রিকার মে সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান yuktibadira@gmail.com এ। ধন্যবাদ।

-যুক্তিবাদীরা-

যুক্তির পথে আমরা